ভারতীয় সভ্যতা

শ্রীব্রজসুন্দর রায়, এম.এ.
প্রণীত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত
১৯৪৬

ভারতীয় সভ্যতা

শ্রীব্রজসুন্দর রায়, এম.এ.
প্রণীত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত
১৯৪৬

মূল্য এক টাকা

PRINTED IN INDIA

PRINTED AND PUBLISHED BY NISHITCHANDRA SEN,
SUPERINTENDENT (OFFG.), CALCUTTA UNIVERSITY PRESS,
48, HAZRA ROAD, BALLYGUNGE, CALCUTTA.

1536 B.—June, 1946—E.

উৎসর্গ-পত্র

আমার পিতামহ স্বর্গীয় কালীকান্ত রায় মহাশয়ের মধ্যে
অনাবিল হিন্দু-সভ্যতার মূর্ত্ত প্রকাশ দেখিয়া সত্য কি
তাহা কতকটা বুঝিয়াছিলাম।
তাঁহার পবিত্র স্মৃতির পূজায় অর্ঘ্যরূপে
এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ
নিবেদন করিলাম।

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

মুখবন্ধ

এই পুস্তিকার জন্মবৃত্তান্ত পাঠকের অবগতির জন্য একটু নিবেদন করা আবশ্যক মনে করিতেছি। হিন্দুদিগের দুর্ব্বলতা পীড়াদায়ক, তাই এই বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের পূজার বন্ধে শিলংএ থাকিয়া Indian Civilisation নামে ইংরেজীতে সংক্ষিপ্ত পাঁচটী রচনা লিখিলাম, এক বন্ধুকে অনুরোধ করাতে তিনি পাঠ করিলেন। কলিকাতায় আসিয়া গুণগ্রাহী ও বিদ্বজ্জনের বন্ধু ডাক্তার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে দেখিতে বলিলাম। আমার প্রতি তাঁহার সহানুভূতি গভীর। তিনি কিঞ্চিৎ পাঠ করিয়া বাংলাতে এইগুলি অনুবাদ করিতে বলিলেন। তদনুসারে বাংলায় আমি রচনাগুলি পুনরায় লিখিলাম এবং তাঁহার অনুমোদনের প্রার্থনা জানাইলাম। তিনি পুনরায় আমার বাংলা রচনাগুলি পাঠ করিয়া অনুমোদন করিলেন। ইহাতে আনন্দিত হইয়া শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু স্বর্গীয় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সাহায্যে যাদবপুর জাতীয় শিক্ষা পরিষদের Extension Lectures রূপে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে এখানকার কলেজ স্কোয়ারস্থ বৌদ্ধ মন্দিরে শ্রোতৃবর্গের নিকট পাঠ করিলাম। ইঁহাদের মধ্যে কোনো কোনো বিজ্ঞ ব্যক্তি এইগুলি পুস্তকাকারে ছাপাইতে উপদেশ দিলেন। অর্থাভাববশতঃ পুনরায় হিন্দুমহাসভার সভাপতি ডাক্তার মুখোপাধ্যায়ের শরণাপন্ন হইলাম। তাঁহার অসীম ধৈর্য্য ও আমার প্রতি অসাধারণ সহানুভূতির ফলে তিনি এই গ্রন্থ-প্রকাশে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু কাগজ যে দুষ্প্রাপ্য এই কথাও জানাইলেন। আমি পরে টিটাগড় পেপার মিলের নিকট আমার কাগজের প্রয়োজন এবং ডাক্তার মুখোপাধ্যায় সাহায্য করিবেন এই কথা লিখিয়া এক দরখাস্ত পেশ করিলাম। মিলের কর্ত্তৃপক্ষ কাগজের প্রয়োজন-সম্বন্ধে ডাক্তার মুখোপাধ্যায়ের চিঠি চাহিলেন। ডাক্তার মুখোপাধ্যায় আমাকে জানেন এবং কাগজের প্রয়োজন আমার আছে, এই চিঠি তিনি দেওয়াতে মিলের কর্ত্তৃপক্ষ ২০ রিম কাগজ আমাকে দিলেন। ডাক্তার মুখোপাধ্যায়ের অপরিসীম সহানুভূতি ও সাহায্যে য়ুনিভারসিটীর কর্ত্তৃপক্ষ এই পুস্তক প্রকাশ করিয়া আমাকে অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। আমি ডাক্তার মুখোপাধ্যায়, মিলের কর্ত্তৃপক্ষ এবং য়ুনিভারসিটীর বন্ধুগণের নিকট অবর্ণনীয়ভাবে কৃতজ্ঞ রহিলাম।

হিন্দু সভ্যতারূপ মহামহীরুহের কয়েকটী পত্র মাত্র আমি পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। ইহাতে মহীরুহের পরিচয়লাভ হইবে কি না পাঠকই জানেন। না হইলেও, ক্ষমালাভ করিব, আমার আশা আছে, কেননা সৎকার্য্যে চেষ্টা মাত্র আমরা করিতে পারি। হিন্দু সভ্যতা কেন, সমস্ত দেশের সকল প্রকারের জাতীয় সভ্যতাই আজকাল নৃতত্ত্ব-নামক বিজ্ঞানে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আলোচিত হইতেছে। মানুষ কোন্ যুগে সৃষ্ট হইয়াছিল, কি কি শাখাতে মানবজাতিকে বিভক্ত করা যাইতে পারে, কোন্ শাখার কি মৌলিক স্বভাব, এবং আবেষ্টন দ্বারা সেই স্বভাব কি ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়, কি কি যুগপরিবর্ত্তনে বা epoch সমূহের ভিতর দিয়া এক একটা সভ্যতা উৎকর্ষ লাভের পথে অগ্রসর হইয়াছে, এই সকল তত্ত্বের বিচার হইতেছে। আমি ভারতীয় সভ্যতা-সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিতে সমর্থ নহি। ইতিহাস ও ধর্ম্মগ্রন্থে এই সভ্যতার যে সামান্য পরিচয় পাইয়াছি, তাহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতে চাই। হিন্দুসভ্যতা-সম্বন্ধে শত শত গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে ও হইতেছে, তথাপি এই সভ্যতার স্বরূপ সম্যক্‌রূপে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, মনে হয় না, কেননা আমরা ইউরোপীয় গুরুগণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া "সত্য-শিব-সুন্দরে"র প্রকৃত স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেছি না। আমরা বিভ্রান্ত হইয়া মানব-সভ্যতা যে কেবল দেহের

সুখসুবিধা-বিধানের জন্য নহে, এবং একটী পূর্ণাঙ্গ সভ্যতাতে দেহ-মন ও আত্মার উৎকর্ষ-লাভের প্রয়োজন, তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। দেহের শক্তি, দেহের স্বাস্থ্য এবং দেহের আরাম-বিধান সভ্যতা করিয়া দিবে এবং তজ্জন্য মানসিক শক্তির বিকাশের দ্বারা বৈজ্ঞানিক প্রণালীর উদ্ভাবন করিবে, এই মত আজ প্রবল। অসভ্যাবস্থায় Magicদ্বারা তাহা সম্পাদন করার চেষ্টা হইত, আজ বিজ্ঞান তাহা করিতেছে। Dr. Fraser তাঁহার Golden Bough নামক গ্রন্থে বলেন : "Man's future progress, moral, intellectual and material, is bound up with science and hence to hamper the progress of science is to hamper human progress."

আত্মা-সম্বন্ধে Dr. Fraser নির্ব্বাক, কেননা দেহাতিরিক্ত আত্মা-নামক পদার্থের উল্লেখ করিলে বৈজ্ঞানিকগণ হয়ত আপত্তি করিবেন ও হাস্য সংবরণ করিতে পারিবেন না।

হিন্দু-সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায় যে দেহ, মন ও আত্মা এই তিন দিকেই মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে। ঋষিগণ সত্য-শিব-সুন্দরকে যাহাতে লাভ করিয়া পূর্ণ আনন্দ পাইতে পারেন, তজ্জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। দেহের সুখ-সুবিধার জন্য অন্নসংগ্রহ, গৃহনির্ম্মাণ, শিল্প-কৌশল-উদ্ভাবন প্রভৃতি কার্য্যে বুদ্ধি ব্যয় করিয়াছেন এবং মানসিক শক্তি-বিকাশের জন্য নানাপ্রকার বিজ্ঞান এবং তর্কশাস্ত্রাদিরও সৃষ্টি এবং আলোচনা করিয়াছেন। দার্শনিক বিচার দ্বারা দেবতা-তত্ত্ব, পরকাল-তত্ত্ব ও মানুষের সহিত বিশ্বের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছেন। এই সভ্যতাতে প্রকৃতিকে জয় করা অপেক্ষা প্রকৃতির সহিত সখ্য-স্থাপনের উদ্যোগ অধিক। প্রকৃতির শক্তিতেই ঋষিগণ শক্তিমানের পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। প্রকৃতির পূজা আজও এদেশে চলিতেছে, কেননা প্রকৃতি ও তদন্তর্গত দেবতাই আমাদের বরণীয়। আমরা দেহদ্বারা প্রকৃতির সহিত যুক্ত, প্রকৃতির জল, বায়ু ও তেজের দ্বারা আমরা দেহী; প্রকৃতির আত্মাই আমাদের আত্মা, এই ভাবে বিশ্বমৈত্রী সাধন করিতে হইবে, কেননা "মমাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা" এবং "নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু" হওয়া আমাদের আদর্শ। প্রকৃতির সহিত লড়াই করিয়া হিংসার পথ অবলম্বনপূর্ব্বক Self-preservation এবং Race preservation আমাদের মূলমন্ত্র নহে। আগুনে হাত পোড়ে, কিন্তু অন্ন তদ্‌দ্বারা পাক হয়; কাজেই জ্ঞানদ্বারা প্রকৃতিকে জানিয়া, তাহার অনুগ্রহ লাভ করিতে হইবে এবং জীবনকে নিরাপদ্ করিতে হইবে। বেদ ও পুরাণে এই ভাব ফুটিয়াছে। বেদান্ত এই সত্যকে হৃদয়ে লাভ করিয়া ধ্যান-নিমগ্ন হইতে উপদেশ দিয়াছেন। ধ্যানের ঘরে প্রবেশ করিলেই সত্য-শিব-সুন্দরকে পূর্ণভাবে দেখা যায় এবং সকল দুঃখ তিরোহিত হয়। আত্মাতেই প্রকৃতির পূর্ণ তত্ত্ব প্রকাশিত, লেবরেটরিতে নয়। এই সভ্যতার প্রকৃতি উত্তমরূপে বুঝিতে হইলে, ইহার ক্রমবিকাশ কি ভাবে ধর্ম্ম-সাধনের ভিতর দিয়া ঘটিয়াছে তাহা দেখিতে হয়। আমি এই কঠিন কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত নহি এবং সমর্থও নহি। আমি প্রথম কয়েকটী বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে কিছু নিবেদন করিব, দ্বিতীয় প্রবন্ধে ঐতিহাসিক পরিস্থিতি আলোচনা করিব, তৃতীয় প্রবন্ধে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও তাহার সাধনা যাহা বুঝিয়াছি, তাহা উপস্থাপিত করিব, চতুর্থ প্রবন্ধে নৈতিক ও সামাজিক ভিত্তি কি ভাবে গঠিত হইয়াছে এবং পঞ্চমে বিদেশী সংঘাতের আক্রমণ কি ভাবে হজম করা যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিব।

১১ই আগষ্ট, ১৯৪৪ সন
কলিকাতা

গ্রন্থকার

ভারতীয় সভ্যতা

(১) বৈশিষ্ট্য

কোন সভ্যতার প্রকৃতি নির্ণয় করিতে হইলে অন্য সভ্যতার সহিত তাহার তুলনা অপরিহার্য্য। আজকাল পৃথিবীর সর্ব্বত্র বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতার জয়গান গীত হইতেছে এবং এই সভ্যতাই বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। কাজেই আমাদের প্রাচীন প্রাচ্য সভ্যতা হেয় বলিয়া নিন্দিত হইতেছে। ভারতীয় সভ্যতার নিন্দা, য়ুরোপীয় ধর্ম্ম-প্রচারক, শাসক, ব্যবসাদার এবং লেখকগণের আজও উপজীব্য হইয়া আছে। মিস্ মেওর ন্যায় ভারতের নিন্দুকগণ আজও সগর্ব্বে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া জগতের নিকট প্রশংসিত হইতেছেন এবং শাসকগণেরও গুপ্ত সহানুভূতি-লাভে কৃতার্থ হইতেছেন। আমাদের সভ্যতার কি স্বদেশী কি বিদেশী স্তাবকগণ অধিকাংশ স্থলেই ছাপাই সাক্ষী খাড়া করিয়া, 'অপরাধী নহি' এই ভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া বলিতে প্রয়াস পাইতেছেন যে, "আমরাও তোমাদের পদাঙ্কানুসরণ করিতেছি, কাজেই অতটা 'দোষী' নহি। পিতামহগণ দোষী হইতে পারেন, কিন্তু আমরা তাঁহাদের দোষ শোধরাইয়া লইতেছি। আমরা ত তোমাদের প্রদত্ত শিক্ষা লাভ করিতেছি, সুতরাং তোমাদের ন্যায় সভ্য হইতে বিশেষ দেরী নাই।" আমাদের স্বর্গীয় বন্ধু মহামতি সি. এফ্. এণ্ড্রুজের ন্যায় লেখকগণ কেন, আমরা নিজেরাও, এইরূপই কৈফিয়ৎ দিয়া থাকি। পক্ষান্তরে, বিশেষ চিন্তার সহিত বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, আমাদের জীবনে আমাদের প্রাচীন সভ্যতাই এখনও মূর্ত্ত ও জীবন্ত আছে এবং আমাদের স্থায়িত্ব ইহার মূল সত্যের সহিত অনুস্যূত। কোন বিষয়ের সমগ্র ভাবে বিচার না করিলে সত্য নির্দ্ধারণ করা কঠিন এবং তাহার দোষ-গুণেরও পরিমাণ করা যায় না।

স্থায়িত্বের দিক্ দিয়া যে এই সভ্যতার একটা শ্রেষ্ঠতা রহিয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রাচীন অন্য সব সভ্যতা, যথা—গ্রীসীয়, রোমীয়, মিশরীয়, বাবিলনীয়, আসিরীয় প্রভৃতি কালগর্ভে নিমজ্জিত; কিন্তু ভারতীয় সভ্যতা, কতক পরিমাণে রূপান্তরিত হইলেও, আজও প্রাচীনের সঙ্গে যোগ রক্ষা করিয়া আর্য্য-সভ্যতা বলিয়াই পরিচয় দান করে। এই দীর্ঘ-জীবন-লাভের কারণ কি কি এবং আমাদের জীবনে যে Europeanisation চলিতেছে তাহার কতটা গ্রহণীয় এবং কতটা বর্জ্জনীয়, সেই বিষয়ে চিন্তা করা আবশ্যক। আমাদের যে ভুল-ভ্রান্তি হইতেছে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কি সমাজগঠনে, কি ধর্ম্মানুশীলনে, কি জীবনসংগ্রামে, কি রাষ্ট্রশাসনে আমরা যেন ঠিক পথ পাইতেছি না। "আমরা বিচ্ছিন্ন," "আমরা দুর্ব্বল," "আমাদের বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা নির্ম্মূল হইয়া যাওয়া শ্রেয়স্কর" ইত্যাকার নৈরাশ্যসূচক কথা অনেকে বলেন। কিন্তু ব্যক্তি যেমন ইচ্ছা করিলেই বিদেহ হইয়া যাইতে পারে না, একটা দেশের অধিবাসিবৃন্দও তদ্রূপ ইচ্ছাপূর্ব্বক নির্ম্মূল হইয়া যায় না বলিয়া এই নৈরাশ্যের পরামর্শ একেবারেই গ্রহণীয় নহে। অন্যান্য জাতির ন্যায় আমাদিগকেও বাঁচিবার জন্যই চেষ্টা করিতে হইবে। এদেশে মানুষকে শ্রেষ্ঠতা ও দেবত্বলাভের পন্থাই প্রদর্শন করা হইয়াছিল এবং মানব-প্রকৃতির জ্ঞানও এদেশেই উত্তমরূপে বিশ্লেষণ করা

হইয়াছিল। আমরা সেই সব সত্য ভুলিয়া গিয়াছি, তজ্জন্য দুর্ব্বল হইতেছি। য়ুরোপীয় রজঃপ্রধান বা কামনামূলক সভ্যতাও মানুষকে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর করিতেছে। নবপ্রস্তর-যুগ হইতে দশ কি বারো হাজার বৎসরে মানুষ যে উৎকর্ষ লাভ করিয়া গর্ব্বিত হইতেছে, তাহা ত আর স্থিতিশীল হইতে পারিতেছে না; ত্বরিত গতিতে গতিশীল হইয়া ধ্বংসাভিমুখে প্রধাবিত, মনে হয়; আশা এই মাত্র যে বিধাতা তাঁহার সৃষ্টি বিনষ্ট হইতে দিবেন না। আমাদের সভ্যতা অত গতিশীল নহে, তথাপি আমরাও পরিবর্ত্তিত হইতেছি। কালের প্রভাব কালাধীন এবং দেশাধীন সত্তার পক্ষে অনতিক্রমণীয়। আমাদের দৃষ্টি প্রাচীনের দিকে নিবদ্ধ রাখিয়াই আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। অতীতকে বর্জ্জন করিয়া অজ্ঞাত ভবিষ্যতের দিকে ঝাঁপাইয়া পড়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে।

বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ বঙ্গদেশবাসী হিন্দুগণ নানা ভাবে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। এই বিষয়ে চিন্তা করিতে যাইয়াই কিছু লিখিতে প্রয়াসী হই এবং হিন্দু সমাজে কি ভাবে একতা সম্পাদিত হইতে পারে তাহার আলোচনা করি। একটু জাগরণের ভাব যে আমাদের মধ্যে দেখা দিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তথাপি যেন আমাদের জাতীয় চেষ্টা ও উদ্‌যোগে একতা সম্পাদিত হইতেছে না। আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না, যদিও তাঁহারা ধর্ম্মের নামেই নেতৃত্ব করেন। বিদেশী শাসকগণ ধর্ম্মবিশ্বাসকে রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি করিয়া ধর্ম্মবিদ্বেষের অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছেন। এই অগ্নিতে যে সকলের গৃহই ভস্মীভূত হইতে পারে, তাঁহারা তাহা বিবেচনা করেন নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর অরাজকতা যদি এদেশে পুনরায় প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে তাহাতে "পাকিস্থান," "হিন্দুস্থান" "এংগ্লোস্থান" (big cities) সবই ছাই হইয়া যাইবে। যদি আমাদের প্রকৃত সমাজপতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ একত্র হইয়া, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য শক্তি ও ক্ষাত্র শক্তি এক যোগে যুক্ত হইয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করেন এবং হিন্দুকে কিরূপে সংঘবদ্ধ করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে আলোচনা করেন, তাহা হইলে ক্রমে শক্তিলাভ হইতে পারে। একদল প্রাচীনের দিকে ঝুঁকিয়া আছেন এবং একদল নবীনতা-লাভের জন্য প্রাচীনকে হেয় মনে করিতেছেন। ইহাতে একতালাভ অসম্ভব হইয়া রহিয়াছে। আমরা য়ুরোপীয় শিক্ষা লাভ করিয়া মনে করিতেছি পণ্ডিত মহাশয়গণ ভ্রান্ত এবং পক্ষান্তরে তাঁহারা আমাদিগকে বর্জ্জনীয় মনে করিতেছেন। ইহাতে পথ পাওয়া যাইতেছে না।

হিন্দু যে দুর্ব্বল নহে, ভয় পাওয়ার যে কোনো কারণ নাই, এবং হিন্দু-সভ্যতার যে জগৎকে কিছু দেবার আছে, তাহা দেখাবার একটু চেষ্টা করা যাইবে। পৃথিবীতে যে বিবাদ, বিসংবাদ চলিতেছে, তাহার প্রতীকার-পন্থা হিন্দুকে দেখাইতে হইবে, কেন-না হিন্দুর মধ্যে একটা অনাক্রমণের মনোভাব বিদ্যমান আছে। ভারতের ইতিহাস হিন্দুর অগৌরব কীর্ত্তন করে না। পরধন-লুণ্ঠন, পরের স্বাধীনতা-হরণ প্রভৃতি হিংসার ভাব হিন্দুদিগের মধ্যে প্রধান মনোবৃত্তি হইয়া কোনোদিন ওঠে নাই। ধর্ম্ম ও ন্যায়কে রক্ষা করার জন্যই মহাভারত ও রামায়ণ-বর্ণিত যুদ্ধদ্বয় সংঘটিত হইয়াছিল। কুরুক্ষেত্র-সমরে যেরূপ মনোবৃত্তি লইয়া অর্জুন যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, আজও আমাদের নেতৃবৃন্দ সেই ভাবেই সত্য ও ন্যায়ের আসনে উপবিষ্ট হইয়া বিবাদ-মীমাংসার চেষ্টা করিতেছেন। ধর্ম্ম ও নীতি-রক্ষার জন্যই হিন্দুদিগকে একতাসম্পন্ন ও শক্তিশালী করিতে হইবে, অন্যের উপর প্রভুত্ব-লাভের জন্য বা অন্যের ধন ছলে-বলে-কৌশলে হরণ করার জন্য নহে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ভীরু বা কাপুরুষ ছিলেন না, তাঁহারা সর্ব্বদাই আত্মরক্ষা ও ধর্ম্মরক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা যুদ্ধ করিয়াই নিজেদের ধর্ম্ম ও কৃষ্টি রক্ষা করিয়াছিলেন।

ইতিহাস মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে দেখা যায় যে, যখন সেকেন্দর খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ভারত আক্রমণ করেন, তখন সীমান্তদেশবর্ত্তী রাজ্যসমূহ এক একটী করিয়া জয় করিতে তাঁহাকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। একদল আক্রমণকারী আততায়ী যখন একটা গ্রাম অতর্কিতে আক্রমণ করে, তখন তাহারা সংখ্যায় অল্প হইলেও গ্রামবাসী বহুলোক তাহাদের সহিত লড়াইয়ে সাধারণতঃ জয়লাভ করিতে পারে না, কেন-না আততায়িগণের মধ্যে যেরূপ একপ্রাণতা ও জীবনের প্রতি মমতাশূন্যতাপ্রসূত সাহস দেখা যায় আত্মরক্ষাকারিগণের মধ্যে সেরূপ উন্মত্তভাব জন্মে না। একজন পাগলকে দশজন প্রকৃতিস্থ লোকের শান্ত করা কঠিন হয়। অনাক্রমণ-ভাবাপন্ন লোকদিগের পক্ষে ধর্ম্মোৎসাহে উন্মত্ত ও লুণ্ঠনপরায়ণ আক্রমণকারিগণকে প্রতিরোধ করা কঠিন হইয়া রহিয়াছে। তাই আজও আমরা বিপন্ন। যৌক্তিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন হিন্দুকে আজও উৎসাহ ও উদ্দীপনাপূর্ণ যুবভাবাপন্ন মনোবৃত্তির নিকট হার মানিতে হইতেছে। বহু শাস্ত্রে, বহু অবতারে, বহু মতবাদে আস্থাসম্পন্ন হিন্দুকে আজও এক গ্রন্থে বিশ্বাসী এবং এক নেতার হুকুমে পরিচালিত দলের নিকট বাধা-প্রাপ্ত হইতে হইতেছে। দ্বিতীয় প্রবন্ধে "ঐতিহাসিক ধারা"-আলোচনার সময়ে এই সম্বন্ধে উদাহরণ-দ্বারা দেখান যাইবে যে, হিন্দুদের বীর্য্যের অভাব ছিল না, কিন্তু এক যোগে কার্য্য করা হয় নাই। শিক্ষাদ্বারা এই একতা গঠিত হওয়া দরকার।

ইউরোপীয় সভ্যতার ক্রমবিবর্ত্তন এবং ভারতীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশ পৃথগ্‌ভাবে সংঘটিত হইয়াছে। ইউরোপীয় সভ্যতাতে predatory বা লুণ্ঠনপরায়ণ মনোবৃত্তি বিশেষভাবে ফুটিয়াছে। হোমরে যে যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে তাহা প্রকৃত পক্ষে ট্রয় নগর ধ্বংস করিয়া তাহাদের রাজ্য, বাণিজ্য ও সম্পত্তি হরণ করার জন্য সংঘটিত হইয়াছিল। ট্রয় ধ্বংস করিয়া এশিয়া মাইনরে গ্রীকগণ উপনিবেশ স্থাপন করেন। সেই সময়েই তাঁহাদের মধ্যে শ্রেণীবিদ্বেষ বেশ প্রবলভাবে দেখা দেয়। রাজন্যবৃন্দ সাধারণ লোকের উপর অত্যাচার করিতেন। রাজাদের উৎপীড়নে ব্যতিব্যস্ত হইয়া অভিজাত-সম্প্রদায় গ্রীসের নানাস্থানে কৌলীন্য-শাসন বা aristocracy স্থাপন করেন। সাধারণ লোকেরা পুনরায় অভিজাত-বর্গের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রেণীতে শ্রেণীতে এইরূপ মারামারি আজও ইউরোপে চলিতেছে। ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে যে, হোমরের সময়ে যেভাবে রাজন্যবর্গ, কুলীন-সম্প্রদায় এবং সাধারণ লোক পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন, আজও সেইভাব চলিতেছে; ইহাতে ইউরোপীয় সব শ্রেণীর লোকই বেশ সবল বুদ্ধিমান্ ও স্বাধিকার-বিষয়ে সজাগ হইয়া রহিয়াছেন। বিরোধী ভাব তাঁহাদিগকে ব্যক্তিত্ব দান করিয়া লুণ্ঠনপরায়ণ করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহারা কিরূপে দুর্ব্বলকে অধিকারে রাখিয়া তাহার শ্রমলব্ধ ফল ভোগ করা যাইতে পারে, তাহা ভাল জানেন। তাঁহাদের দেশের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই। আহার জোটাইবার জন্য বাহিরে যাইতে তাঁহারা বাধ্য হইয়াছেন। একদেশবাসিগণের মধ্যেই দ্বন্দ্বযুদ্ধ সর্ব্বদা চলিত ও চলিতেছে, বিভিন্নদেশবাসীর ত কথাই নাই। প্রাচীন গ্রীসের এবং রোমের অধিবাসিবর্গ সকলেই যুদ্ধ শিক্ষা করিত এবং প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকিত।* ঐহিক জীবনের জন্য সংগ্রামই তাঁহাদের পক্ষে প্রধান সংগ্রাম ছিল। তাই তাঁহারা অধিক কার্য্যপটু,

* মানুষের বুদ্ধির যে উৎকর্ষ ও প্রাখর্য্যলাভ ঘটিয়াছে, তাহার অনেকখানি শত্রুর সহিত লড়াই দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে। আজও যে বৈজ্ঞানিক যুগ চলিতেছে, তাহারও অনেকটা শত্রুতাতে জয়লাভের আকাঙ্ক্ষা-প্রণোদিত। ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতি শত্রুর সহিত লড়াই অপেক্ষা মানুষের সঙ্গে লড়াই করিতে অধিক কৌশলের প্রয়োজন হয়।

উৎসাহী ও উদ্যমশীল। এক কথায়, ইউরোপীয়েরা যুবভাবাপন্ন। যৌবনসুলভ উদ্দীপনা তাঁহাদের মধ্যে দেখা যায়। যৌবনে মানুষ পুরাতনকে আঁক্‌ড়াইয়া থাকিতে চায় না; নূতনকেই চায়। তাই ইউরোপের সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র, শিল্পব্যবস্থা প্রভৃতিতে নিত্য নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইতেছে। যাহা আছে তাহাতে তাঁহারা সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহাদের নানা প্রকার সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য-লাভের প্রয়োজন, তজ্জন্য অন্যকে ধ্বংস করিতে তাঁহাদের বাধে না। এককথায় বলিতে পারা যায় যে, ইউরোপীয় সভ্যতা শরীর ও সংসারকে জীবনের মূল সত্যরূপে গ্রহণ করিয়া গঠিত হইয়াছে এবং শারীরিক মঙ্গল বা প্রেয়ঃকে বরণ করিয়াই অগ্রসর হইতেছে। "শ্রেয়ঃ বা আত্মিক মঙ্গলকে" জানিলেও "শ্রেয়ঃ" দ্বারা তাহার প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইতেছে না।

রোমকগণ যখন খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, তখনও তাঁহারা পরধন ও পরের স্বাধীনতা হরণ করিতে এইরূপ অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিলেন যে, এই ধর্ম্মের দ্বারাও রোমকেরা জগতের উপর অত্যাচারই করিয়াছেন। তাঁহাদের মিশনারীগণকে ধর্ম্ম-প্রচার-ব্যপদেশে অন্য জাতির উপর প্রভুত্বস্থাপনেই অধিক মনোযোগী দেখা যায়। জ্ঞান-প্রচার করিতে যাইয়া, কিংবা লোকশ্রেয়ঃ-সাধনের অছিলায়ও নিজেদের প্রভুত্ব-স্থাপনেই আজও তাঁহাদিগকে অধিক মনোযোগ দিতে হইতেছে। একেবারে নিঃস্বার্থভাব-সাধন অত্যন্ত কঠিন; তাহা তখনই সম্ভবপর হয় যখন সকলের এক আত্মা এই বিশ্বাস হৃদয়ে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়। একাত্মতা-সাধন ইউরোপীয় মনোবৃত্তির পক্ষে সহজ নহে। কেননা তাঁহাদের মূল যে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বা Metaphysics রহিয়াছে, তাহাতে এই একাত্মতা দার্শনিকগণের মধ্যে কেহ কেহ স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সমাজগত জীবনে উহা স্বীকৃত হয় নাই। আমাদের কিন্তু সাধারণ নিরক্ষর বৈষ্ণবেরাও "মমাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা, মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ" মন্ত্র রোজ আওড়াইয়া চিন্তাদ্বারা জগতের সঙ্গে একাত্মতা সাধন করেন। আর একটী উদাহরণ এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে। শ্রীমদ্‌ভাগবতে বর্ণিত রাজা রন্তিদেবের একটী প্রার্থনা উদ্ধৃত করিতেছি:

> ন কাময়েঽহং গতিমীশ্বরাৎ পরামষ্টর্দ্ধিযুক্তামপুনর্ভবং বা
> আর্ত্তিং প্রপদ্যেঽখিলদেহভাজামন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ ॥

ইহার মূল কথা—পরের জন্য দুঃখ বহন করা ভগবানে প্রীতিমান্‌দিগের স্বভাব। তাই রন্তিদেব বলিতেছেন, "আমি পরমেশ্বরের নিকট অণিমাদি অষ্টসিদ্ধিসমন্বিত গতি অথবা মুক্তি প্রার্থনা করি না; আমার প্রার্থনা এই—আমি যেন সকল জীবের অন্তরে অবস্থিতি করিয়া তাহাদের দুঃখ ভোগ করি, যেন তদ্দ্বারা তাহাদের দুঃখ আমা হইতে দূর হইতে পারে।" অন্যের সঙ্গে একাত্মতা-সাধন, সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি ইত্যাদি ভাবের কথা এদেশের নিরক্ষর লোকেরাও ব্যবহার করে। শিষ্যের সঙ্গে গুরুর একাত্মতা-সাধনের চেষ্টা এদেশে হইয়া থাকে। পরের পাপের বোঝা নিজের স্কন্ধে না লইয়া প্রাণে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করার প্রয়োজন, এই তত্ত্ববোধ একাত্মতাসাধন-ব্যতিরেকে হইতে পারে না। অসভ্য বর্ব্বর মানুষকে পৃথক্ রাখিয়া দিয়া তাহাকে উন্নতি দান করিলেও তাহার সহিত শত্রুতা নিরাকৃত হয় না। ভারতীয় সভ্যতাতে এই জীবনের অনিত্যতা অত্যন্ত প্রবলভাবে অনুভূত হইয়াছে এবং তজ্জন্য ঋষিগণ দেহের সুখ-সুবিধাতে বেশী মনোযোগ দেন নাই; দেহকে ধর্ম্ম-সাধনের যন্ত্ররূপেই ব্যবহার করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন এবং সেই ভাবেই দেহের প্রয়োজন-সিদ্ধির ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এখানে শ্রেণী-বিদ্বেষ একেবারে ছিল না, বলা যায় না। কেননা শ্রেণী-বিভাগ ও বর্ণ-বিভাগ বিশেষ দৃঢ়ভাবেই প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। তথাপি প্রত্যেকের জীবনে জাতিভেদ দ্বারা সুখ-সৌভাগ্য-লাভের একটা নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা বর্ত্তমান থাকাতে, হিংসার ভাব প্রবল হইতে পারে নাই। বিশেষতঃ সমাজের শীর্ষস্থানীয় লোকেরা ত্যাগ ও দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া ধর্ম্মচর্য্যা ও জ্ঞানানুশীলনে ব্যস্ত থাকাতে, তাঁহাদের নিকট সকলেই নতি স্বীকার করিতেন। শাসক-সম্প্রদায়ও ত্যাগ-মন্ত্রেরই সাধনা করিতেন। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদির আদর্শ-সম্বন্ধে চতুর্থ প্রবন্ধে অলোচনা করার ইচ্ছা আছে। এদেশে যে দীর্ঘকাল শান্তি বিরাজ করিয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আধ্যাত্মিক জীবন-লাভ শান্তিদ্বারাই সম্ভাবিত হয়। ইউরোপের ইতিহাসে ঝগড়া-বিবাদ সর্ব্বদাই চলিয়াছে, তাই আজও প্রবল শত্রুতা দ্বারা ইউরোপীয়গণ অভিভূত হইতেছেন। তাঁহারা শান্তিভোগ বিশেষ করিতে পারেন নাই, সর্ব্বদাই শত্রুর সঙ্গে তাঁহাদের লড়াই চলিতেছে, তাই তাঁহারা সবল ও পরাক্রান্ত। কিন্তু সিংহ-ব্যাঘ্রাদির ন্যায়ই তাঁহারা হিংস্র-স্বভাবাপন্ন। জার্ম্মান দার্শনিক ও ইতিহাসের অধ্যাপক নিট্‌সে যিশুর ভক্তি ও ত্যাগের আদর্শকে বর্জ্জন করিয়া সিংহব্যাঘ্রের ন্যায় পুরুষকার অবলম্বনের জন্য স্বদেশবাসীকে আহ্বান করিয়াছেন এবং ফলে দেখা যায় যে, সেই আহ্বানই তাঁহাদের দেশবাসিগণ শুনিয়াছেন। হিন্দু সভ্যতাতে আত্মার মঙ্গলের জন্য ত্যাগের প্রয়োজন থাকা বশতঃ আত্মাকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। এই পার্থক্য অল্প নহে।

আসিরীয়, ব্যাবিলনীয় বা মিশরীয় সভ্যতাতে ধর্ম্মের ভাব দেখা যায় সত্য, এবং তাঁহাদের মধ্যেও গভীর চিন্তা ও ধর্ম্মবিশ্বাস বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু ভারতের ন্যায় আত্মতত্ত্ব-লাভে এত প্রবল চেষ্টা দেখা যায় না ; দেহ ও আত্মার পার্থক্য এইভাবে তাঁহাদের দ্বারা সাধিত হয় নাই, আত্মার স্বরূপও তাঁহাদের মনীষিগণ এই ভাবে ঋষিদের ন্যায় উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, কেননা তাঁহাদিগকেও শত্রুর সহিত যুদ্ধেই অধিক ব্যাপৃত দেখা যায় এবং জীবনের সংস্থান-বিষয়েই তাঁহারা অধিক মনোযোগী ছিলেন। নানা দেব-দেবীর কল্পনা তাঁহারা করিয়াছেন সত্য এবং পরলোক-তত্ত্বেরও চিন্তা করিয়াছেন, কিন্তু এদেশের ন্যায় স্থিরভূমি লাভ করিতে পারেন নাই। ধর্ম্মবিশ্বাসে স্থিরতালাভ না হইলে, শান্তিলাভ হয় না। তাঁহারাও পরের দেশ অধিকার করার জন্য বেশ সচেষ্ট এবং তজ্জন্য মানুষের উপর অত্যাচার করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। আচারানুষ্ঠানের ধর্ম্ম লইয়া তাঁহারাও ব্যস্ত ছিলেন, তাই সম্যক্ আত্মিক দৃষ্টি লাভ করিতে পারেন নাই। চীনদেশের কন্‌ফুশিয়াস প্রভৃতি নীতিবেত্তাদের অনুশাসনে এইরূপ আত্মিক দৃষ্টি দেখা যায় না ; তাঁহারা নীতির প্রাধান্য সাধারণের জীবনে প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছেন বটে, কিন্তু পরলোক-সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইতে পারেন নাই। নীতির বন্ধনে মানুষকে বাঁধা সহজ নহে। মানুষের আত্মা যদি জাগরূক না করা হয়, তবে নীতির বন্ধন দৃঢ় হয় না। আত্মানাত্ম-বিচার ঋষিরা যে ভাবে করিয়াছেন, এইরূপ সূক্ষ্ম অথচ নিঃসন্দেহ তত্ত্ব কোথাও উদ্‌ঘাটিত হয় নাই।

মিশরীয়গণ নানা প্রকারের শিল্পচর্য্যায় বিশেষ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন। পশ্চিম এশিয়ার অধিবাসিগণ আত্মার অমরত্ব অতি-প্রাচীন সময়েই ধরিতে পারিয়াছিলেন সত্য এবং তাঁহাদের পিরামিড্‌সমূহ তাঁহাদের বুদ্ধির প্রাখর্য্য প্রমাণ করে বটে, তথাপি বিচার করিলে দেখা যাইবে যে এদেশের ন্যায় ধর্ম্মানুশীলনে এত চেষ্টা তথায় সম্পাদিত হয় নাই। আমাদের ঋগেবেদাদি পাঠ করিলে দেবতাদের প্রতি যেরূপ কৃতজ্ঞতার ভাব দেখিতে পাই, যেরূপ আগ্রহের সহিত দেবতাদিগকে আর্য্যগণ আহ্বান করিতেন, এবং যেভাবে তাঁহাদের বিশ্বাস প্রকাশ পাইয়াছিল, এইরূপ ভক্তি ও বিশ্বাস ত অন্য কোথাও দেখা যায় না। আসিরীয় প্রভৃতি

সভ্যতার দান অবশ্য বর্ত্তমান সময়ের সভ্যতাতে সংক্রামিত হইয়া মানবজাতির উন্নতিবিধান করিয়াছে। H. G. Wells তাঁহার পৃথিবীর ইতিহাসে কোন্ জাতির কি অবদান দ্বারা মানবসমাজ কিভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছে ও উৎকর্ষলাভ করিয়াছে, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু ভারতীয় ঋষিগণের সাধনা কিরূপে সমগ্র এশিয়া এবং ইউরোপ প্রভৃতি দেশকেও প্রভাবিত করিয়াছে, তাহা দেখাইতে চেষ্টা করেন নাই। তিনি সভ্যতার বহিরাবরণ কি কি এবং কোথা হইতে কোন্ আবরণটী আসিয়াছে, তাহাই দেখাইয়াছেন। শুধু একস্থানে তিনি বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, ইউরোপ রাজনৈতিক উন্নতি ও উদ্যম এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রাধান্য ও মৌলিকতা-সত্বেও যিশুপ্রদর্শিত স্বর্গরাজ্য বা Kingdom of God প্রতিষ্ঠার কথা ভাবিতেও পারিতেছে না এবং পারিবেও না। এই বলিয়াই তিনি নৈরাশ্য প্রকাশ করিয়াছেন। একদল লোক থাকিবেন, যাঁহাদের যথেষ্ট বিশ্রাম থাকিবে এবং যাঁহারা সকল ঐহিক উচ্চাভিলাষের ধার ধারিবেন না এবং জ্ঞানচর্চ্চায় ও ধর্ম্মানুশীলনে ব্যগ্র থাকিবেন—তাঁহাদের আবশ্যকতা তিনি বোধ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ভারতীয় সভ্যতায় যে এই আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং বর্ণবিভাগ ও আশ্রমবিভাগ দ্বারা সমস্ত সমাজকে একটা আধ্যাত্মিক আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ করা হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে তিনি বিশেষ চিন্তা করিয়াছেন, মনে হয় না। ইহুদিদিগের মধ্যে prophetগণ এবং আমাদের ঋষিগণ প্রকৃতপক্ষে এই উচ্চ আদর্শের সেবা করিয়াছেন, কিন্তু ইহুদি-ধর্ম্মেও এখানকার ন্যায় আত্মিক দৃষ্টি খোলে নাই। অন্য ধর্ম্মের প্রতি, অন্যজাতির প্রতি অবজ্ঞা ও শত্রুতার ভাব তাঁহারাও পরিহার করিতে পারেন নাই। আমাদের এই পতিত অবস্থায়ও আমরা মানুষকে যে চক্ষে দেখি, মানুষের প্রতি আমাদের যে শ্রদ্ধা আছে, আমি মনে করি অন্যদের উদারতা-সত্বেও এইরূপ ভাব নাই। মানুষ-মাত্রেই যে ব্রহ্মসত্তায় সত্তাবান্, এই বিশ্বাস সাধারণ লোকের মনেও কার্য্য করে। এমন কি, কীট-পতঙ্গও এই সত্তায় জীবন-প্রাপ্ত। ইহাতেই আমাদের দুর্ব্বলতাও জন্মিয়াছে। অন্য জাতিগণের ঐহিক জীবন-ব্যবস্থায় নৈপুণ্য দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইতে পারি, মহেঞ্জোদারোর সভ্যতায় উচ্চ শিল্পচাতুর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতে পারি, কিন্তু তথাপি বলিতে হইবে যে, নীতি ও ধর্ম্মের বন্ধনে আমাদের সভ্যতা দৃঢ় বলিয়াই আজও তাহা বর্ত্তমান আছে। মানুষের স্থায়িত্বলাভে নীতি ও ধর্ম্মের মূল্য অধিক, তাহা চিন্তাশীল লোকেরা স্বীকার করিবেন। ঋষিগণের নীতির বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে অত্যাচার সহ্য করার শক্তিলাভ হয়। অন্যের উপর অত্যাচার করা অপেক্ষা অত্যাচারিত হইলে আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ হয়, তাই আজও মহাত্মা গান্ধি soul-forceএর কথা বলেন। Soul-force কি বুঝিতে হইলে আধ্যাত্মিক সাধনায় নিরত হইয়া আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হয়।

লুণ্ঠনপরায়ণ লোকেরা, যথা,. গ্রীক, রোমক প্রভৃতি জাতিগণ, অন্যের উপর আধিপত্য করিয়াছেন। কিন্তু কেহই অধিকদিন স্থায়ী হইতে পারেন নাই। সেকেন্দর বাদ্শা দুনিয়া জয় করিয়াছিলেন এবং জাঙ্গিসখান ও তৈমুরলঙ্গ প্রভৃতিও পৃথিবী জয় করিয়া বিখ্যাত বা অখ্যাত হইয়া গিয়াছেন, কিন্তু তথাপি বলিতে হইবে যে, ইহাদের আদর্শ আত্মবান্ মানুষের পক্ষে গ্রহণীয় নহে। আমরা রামচন্দ্র বা যুধিষ্ঠিরের পৃথিবীজয়ে বহির্গত হওয়ার কথা ভাবিতেও পারি না। তাঁহাদের যে ভারতে প্রাধান্যলাভের চেষ্টা ছিল, তাহা একটা সামাজিক ব্যাপার মাত্র। তাঁহারা রাজসূয় প্রভৃতি যজ্ঞে রাজচক্রবর্ত্তিত্ব লাভ করিয়া হিন্দু-সমাজের একতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। টার্কির সুলতানের 'খলিফা'গিরি বা অষ্ট্রিয়ার সম্রাটের 'রোমকাধীশ্বর'ত্ব এই ভাবের সামাজিক একতা সূচিত করে। রামচন্দ্র বা যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করার পূর্ব্বে কোনো রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করেন নাই বা তাঁহার রাজ্য অধিকারও

করেন নাই। ঐতিহাসিক যুগে কেবল সমুদ্রগুপ্ত, হর্ষবর্দ্ধন প্রভৃতি দুইচারিজনকে রাজ্য-বৃদ্ধির কার্য্যে ব্যাপৃত দেখি। কিন্তু অশোকের সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছিল। তিনি বহু বিদেশী রাজ্যের সহিত বন্ধুতা স্থাপন করিয়া ধর্ম্মপ্রচারে সুবিধা লাভ করিয়াছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁহার ন্যায় মানবহিতৈষী লোক দ্বিতীয় নাই। তিনি কলিঙ্গ বিজয় করিয়া যেরূপ অনুতপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার তুলনা জগতে পাওয়া যাইবে না। ধর্ম্ম-প্রচারে যদি তাঁহার অনুষ্ঠিত রীতি প্রবর্ত্তিত হইত, তাহা হইলে মানবসভ্যতা আজ অন্য আকার ধারণ করিত। মুসলমান ও খৃষ্টান ধর্ম্ম-প্রচারে পৃথিবী যে ভাবে মনুষ্যরক্তে রঞ্জিত হইয়াছে, তাহাতে বর্ত্তমান সময়ে যুবকগণ ধর্ম্মের প্রতি যে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, তাহা সহেতুক বলিয়া অনেক সময়ে মনে হয়। ধর্ম্ম-প্রচার-ব্যপদেশে রাজ্যলাভ করার জন্য ব্যগ্রতা থাকাতেই মানব-সমাজ কলুষিত হইয়া রহিয়াছে। আজও সেই কলুষবিষ উদ্‌গীরিত হইয়া আমাদের জীবনকে শঙ্কটাপন্ন করিতেছে। এই যে বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধ চলিতেছে তাহার genesis বা উৎপত্তি সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে ইহার মূলেও ধর্ম্মবিদ্বেষের বহ্নি ধূমায়মান রহিয়াছে। ইউরোপের মধ্যযুগের ইতিহাসে রাজ্যলোলুপতা ও ধর্ম্মোন্মাদতার বিষ একযোগে ক্রিয়া করিয়াছে। Crusade প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া আজও সেই বিষেরই ক্রিয়া চলিতেছে। জাতিতে জাতিতে ধর্ম্মের নামে যে শত্রুতা জন্মিয়াছিল, সেই শত্রুতা রাজ্যলোভের সহিত মিলিত হইয়া প্রবল হিংসার সৃষ্টি করিয়াছে। সেই সহিংস মনোবৃত্তি আধুনিক শিক্ষাদ্বারা দমন করা যাইতেছে না; বরং দৈহিক সুখলাভের লোভবৃদ্ধিবশতঃ তাহাতে ঘৃতাহুতি দেওয়া হইতেছে। তাই শত্রুতার ভাব ক্রমশঃ প্রবলতর হইতেছে। সভ্যজাতিগণ ধর্ম্ম-প্রচার-ব্যপদেশে আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের আদিম অধিবাসীদিগকে প্রায় নির্ম্মূল করিয়াছেন। এদেশে যদিও আর্য্যগণ আদিম অধিবাসীদিগকে পরাজিত করিয়া গঙ্গা প্রভৃতি নদীর উর্ব্বরা উপত্যকাভূমি অধিকার করিয়াছিলেন সত্য, তথাপি আদিম অধিবাসিগণকে সমাজে স্থান দিয়া এক দেহের অঙ্গরূপেই পরিণত করিয়াছেন এবং যাহারা এই সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়েন নাই, তাঁহারাও নির্ম্মূল হইয়া যান নাই। পঞ্চমগণ দক্ষিণভারতে উৎপীড়িত সত্য, কিন্তু এইরূপ উৎপীড়ন প্রাচীন সময়ে বর্ত্তমান ছিল বলিয়া মনে হয় না। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব যখন ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইল, এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পুনঃ সগর্ব্বে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিল ও মুসলমান আক্রমণের পর জাতিভেদের দেওয়ালগুলি দৃঢ়তা ধারণ করিল, তখন হইতে সমগ্র সমাজের জন্য দায়িত্বজ্ঞান তিরোহিত হইল। পূর্ব্বে হিন্দু রাজন্যবর্গ যে ভাবে সমাজের একতা ও সুস্থতার জন্য দায়িত্ব বোধ করিতেন, সেই দায়িত্বজ্ঞান নিশ্চয়ই হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। নিজ নিজ জাতিধর্ম্ম রক্ষার জন্য সকলেই ব্যগ্র হইলেন, কিন্তু সমগ্র সমাজের মঙ্গলকামী ত কেহই রহিলেন না। মুসলমান শক্তি হিন্দুদিগকে অসাড় ও জরাগ্রস্ত করিয়া দিল। এই সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রবন্ধে আরও কিছু আলোচনা করা যাইবে। দক্ষিণ ভারতের পঞ্চমদিগের মধ্যে বহু সাধুর আবির্ভাব হইয়াছিল এবং তাঁহাদের প্রভাব সমস্ত হিন্দু-সমাজে ব্যাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, তাঁহারাও সমাজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সংযুক্ত আছেন। পক্ষান্তরে এখন আমরা যে ভাবে সমগ্র ভারতের বা সমগ্র হিন্দু-জাতির বিষয়ে চিন্তা করি, এই ভাবের চিন্তা শঙ্কর কি রামানুজের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। আধুনিক শিক্ষাদ্বারা আমরা যে ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি লাভ করি, তাহা প্রাচীন সময়ের Aristotle বা Platoর পক্ষেও সম্ভবপর ছিল না, ঋষিদিগেরও ছিল না। প্রাচীনের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিলেও বর্ত্তমানের ভূয়োদর্শন তখন সম্ভবপর হয় নাই। মানুষ যে পর্য্যন্ত দেহে বর্ত্তমান থাকে, সে দেহকে অতিক্রম করিতে পারে না, দেহের প্রয়োজনের উপরে উঠিতে তাহাকে বিশেষ চেষ্টা করিতে হয়।

এদেশের লোকেরাও দৈহিক আরামের জন্যই ব্যস্ত হইয়াছেন এবং "চাচা আপনে বাঁচ" এই নীতিরই অনুসরণ করিতেছেন। বিশেষতঃ শাস্ত্রমার্গানুসারী হওয়াতে মধ্যযুগে কেহ নূতন কথা বলিতে বা নূতন পন্থা অবলম্বন করিতে সাহসও করিত না। বর্ত্তমান সময়ে আমরা এদেশে যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছি, তাহা পূর্ব্বে স্বপ্নের অগোচর ছিল। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব। এই সব কারণে মুসলমান অধিকারের সময়ে হিন্দু-সমাজের অধোগতি হইয়াছিল।

হিন্দু সমাজগঠনে অধিকার বা Rights অপেক্ষা duty বা কর্ত্তব্যপালনে অধিক জোর দেওয়া হইয়াছে। যাঁহারা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা দ্বারা সমাজের সেবা করিবেন, তাঁহারা সমাজের মুখস্বরূপ; যাঁহারা শাসন ও রক্ষণ-ব্যাপারে নিযুক্ত, তাঁহারা সমাজের বাহু, এই ভাবে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, স্ত্রীধর্ম্ম প্রভৃতির ব্যবস্থা স্মৃতিশাস্ত্রে দেওয়া হইয়াছে। সকল বর্ণই সমাজের অঙ্গরূপে পরিগণিত। আজকাল সমাজ-বিজ্ঞানানুসারে সমাজ একটী অঙ্গ এবং মানুষমাত্রেই তাহার প্রত্যঙ্গ বলা হয়, আর কাজে অন্যরূপ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু প্রাচীন সময়ে পরস্পরের প্রতি ব্যবহার বোধ হয় আমাদের ব্যবহার অপেক্ষা অধিক যৌক্তিক ছিল। সকলেরই এক একটা জীবিকা নির্দ্দিষ্ট থাকাতে ব্রাহ্মণ তাঁহার নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি পরিত্যাগ করিলে পতিত হইতেন। এখন আমরা একই শিক্ষা গ্রহণ করিয়া যেভাবে সকলে সকলের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছি, এবং every man is against every other man মনোভাব পোষণ করি, পূর্ব্বে এইরূপ প্রতিযোগিতা ও বিদ্বেষের ভাব মনে অশান্তি সৃষ্টি করিত না। এখন য়ুনিভার্সিটীর অধ্যাপকের যে আদর্শ পথের মুটে মুজরেরও সেই আদর্শ, অর্থাৎ সকলেই লোভী এবং যে কোনো প্রকারে অর্থলাভের জন্য ব্যস্ত। বিদেশী ব্যবসায়ী যেমন আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে সচেষ্ট আমাদের বৈশ্যগণও সেই ভাবেই লাভের জন্য সতত ব্যগ্র। রামায়ণে যে অন্ধমুনি দশরথকে অভিশাপ দিয়াছিলেন, তিনি ছিলেন বৈশ্য। তখন অধিক-সংখ্যক বৈশ্যসভ্য রাজ-সভায় পরামর্শ-দাতা ছিলেন। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে দেখা যায়—রাজারা সকল শ্রেণীর লোকের মত লইয়া রাজ্য শাসন করিবেন এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। শুক্রনীতি প্রভৃতি গ্রন্থে এই সম্বন্ধে আরও বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়। সমাজের জন্য যে তাঁহারা ভাবিতে জানিতেন এবং পরস্পরের সঙ্গে যোগ যে তাঁহাদের চিন্তার বিষয় ছিল, তাহা বেশ পরিষ্কার বুঝা যায়। এখন আমরা Rights বা অধিকার-লাভের দাবী করি। "Students' Rights," "Women's Rights" প্রভৃতি নানা প্রকার নূতন নূতন দাবী খাড়া হইতেছে। পূর্ব্বে কর্ত্তব্য শিক্ষা দেওয়া হইত, কর্ত্তব্য পালন করিলেই Rights বা অধিকার-লাভ হইত। শিক্ষক বা অধ্যাপক তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিলে, স্বামী তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিলে, ছাত্রের বা স্ত্রীর দাবী আপনা আপনি পূরণ হইতে পারে, এবং এই ভাবে কর্ত্তব্য-জ্ঞান-বৃদ্ধি হইলেই জীবনে শান্তি পাওয়া যায়। কেবলই যদি দাবী লইয়া ঠোকাঠুকি হয়, তাহা হইলে সমাজ অশান্তিতে পূর্ণ হইয়া ওঠে। হিন্দুর Rights এবং মুসলমানের Rights লইয়া ঠোকাঠুকি ও মস্তক চূর্ণিত হইতেছে। পূর্ব্বে মুসলমান রাজারাও তাঁহাদের কর্ত্তব্য যে প্রজাপালন তাহা জানিতেন এবং সেই অনুসারে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেন বলিয়াই এতদিন তাঁহাদের শাসন লোকেরা মানিয়া লইয়াছিল। এখনও বরোদারাজ্যে প্রজা-আন্দোলন নাই, কেননা মহারাজ প্রজার মঙ্গল-বিধানেই নিরত রহিয়াছেন। প্রজা-আন্দোলনের মূলকারণ প্রজাপীড়ন ও শোষণ। শোষণ-কার্য্যটী শিক্ষা হইয়াছে ইউরোপীয় ও বিদেশী গুরুগণের নিকট হইতে।

Hindu aggressive নয়। হিন্দু নিজের সভ্যতা অন্যের উপর চাপাইতে চায় না;

নিজের ধর্ম্ম অন্যকে গ্রহণ করাইবার জন্য ব্যস্ত নহে। যে সব হূন, শক প্রভৃতি বিদেশী জাতি এদেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক হিন্দুকৃষ্টি গ্রহণ করিয়া হিন্দু হইয়াছেন। হিন্দুধর্ম্ম কোনো মত-বিশেষকে গ্রহণীয় বা বর্জনীয় বলে না। ইহাতে আত্মিক শুদ্ধতালাভের ব্যবস্থা রহিয়াছে। যাঁহারা বলেন ইহার নৈতিক ভিত্তি দৃঢ় নহে, তাঁহারা এই ধর্ম্মের প্রকৃতি সম্যগ্‌ভাবে না বুঝিয়াই এই কথা বলেন। সত্যবাদিতা, আত্মসংযম প্রভৃতি যে নিতান্ত প্রাথমিক চেষ্টা এবং নীতি-হীন ব্যক্তি যে সমাজেই বাস করিতে পারে না, ইহা ত নিতান্ত বর্ব্বরজাতিগণও স্বীকার করে ও তদনুসারে জীবন-পথে চলিয়া থাকে। এখানে কামনা-বাসনা জয় করিয়া দেহকে অতিক্রম করার জন্য দান, যজ্ঞ, তপস্যা, তীর্থ-দর্শন ইত্যাদি যে ভাবে আজও অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহা ত অন্যত্র দেখা যায় না। অথচ কেহ অন্যকে এই ধর্ম্ম দেওয়ার জন্য ব্যস্ত নহে। হিন্দু কখনও সত্য তাহার একচেটিয়া একথা বলিবে না। তজ্জন্য হিন্দু পরমত-সহনশীল; পরের ধর্ম্মকার্যে বাধা দেওয়া পাপ মনে করে। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ঈশ্বরের রাজ্য, তিনি সকল হৃদয়েই সত্য প্রকাশ করেন, কাজেই হিন্দু ধর্ম্মপ্রচারের জন্য বাহিরে যাওয়া প্রয়োজন বোধ করে নাই; একমাত্র বৌদ্ধেরা গিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রবল মানবপ্রেমের সাধনজন্য ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে জগৎ উপকৃত বই অপকৃত হয় নাই। জগতের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাঁহারা যে অহিংসার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে অর্দ্ধজগৎ আজও বুদ্ধের চরণে প্রণত। আমরা যদি সেই ভাবে জগতের সর্ব্বপ্রকার হিতসাধনের জন্য ব্যগ্র হইয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে পারি, তাহা হইলে আপত্তির কারণ নাই। মানুষের উপদেশের প্রয়োজন আছে। মানুষ পরস্পরকে সাহায্য করিবে ও সাধুপথে চলিতে উৎসাহ দিবে। এই কার্যটি নিঃস্বার্থভাবে করা ত সহজ নহে। শিক্ষকতা কার্য ত চল্লিশ বৎসরের অধিককাল করিলাম, কিন্তু মনে হয় ঠিকভাবে শিক্ষাদান করিতে পারি নাই। যাঁহারা এই কার্য্য ঠিকভাবে করিতে পারেন, তাঁহাদের প্রদত্ত শিক্ষায় জগতের উপকার হয়। মিশনারীগণের মধ্যেও যাঁহারা খাঁটি বিশ্বাস অন্যের হৃদয়ে জাগ্রৎ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের দ্বারা জগতের উপকার হইয়াছে। খৃষ্টান ও অন্যান্য ধর্ম্ম-প্রচারকগণ নিজের জীবনের প্রভাবদ্বারাই অন্যের উপকার করিয়াছেন। সত্য প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। একজনের নিকট যাহা সত্য, অন্যের নিকট তাহা সত্য নাও হইতে পারে। আমাদের ধর্ম্মের মূলমন্ত্র, "সত্যং পরং ধীমহি"। এই বিষয়ে তৃতীয় প্রবন্ধে আলোচনা করিব। এখানে এই মাত্র বলিতে চাই যে, হিন্দুধর্ম্ম উদার বিশ্বজনীন মতের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই ঋষিরা শ্রদ্ধাবান্ শিষ্যদিগকে সত্য শিক্ষা দিয়া নিজের পথ নিজে খুঁজিতে বলিতেন।

হিন্দু সভ্যতার অনাক্রমণভাব মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা-প্রসূত। মানুষমাত্রেই শ্রদ্ধার পাত্র। তাই বিদেশী লোকেরা এদেশে শ্রদ্ধার সহিত গৃহীত হইয়াছেন। বোম্বাই প্রদেশে যখন পারসীকেরা আসিলেন, তাঁহারা ত সাদরে গৃহীত হইলেন। পর্ত্তুগীজ, ইংরেজ, ফরাসী সকলেই এখানে ব্যবসায় করিতে আসিয়া পরে আমাদের সহিত শত্রুতা করিয়াছেন। Major B. D. Bose র "Rise of Christian power" গ্রন্থখানা পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায় যে, বিদেশীয়েরা কি ভাবে আমাদের আতিথ্যের অপব্যবহার করিয়াছেন এবং আজও আমাদের অত্যাচার-সহনশীলতার দরুনই শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে সমর্থ হইতেছেন। আমরা অনুন্নত বা রাজনৈতিক অধিকারের মূল্য জানি না, ইত্যাদিরূপ কত কথাই বলা হয়, কিন্তু যদি আমরা তাঁহাদের ন্যায় পরকে হেয় ও শত্রু মনে করিতাম, তাহা হইলে জমির বন্দোবস্ত দিয়া কলিকাতা প্রভৃতি ছোট ছোট লণ্ডন তৈয়ার করিতে দিতাম না। এই বিষয়ে

হিন্দু ও মুসলমান রাজন্যবর্গ উভয়েই নির্ব্বোধের ন্যায় বিদেশীর প্রতি ভাল ব্যবহার করিয়া পরাধীনতার শৃঙ্খল পায় পরিয়াছেন। এই বিষয়ে দ্বিতীয় প্রবন্ধে আরও আলোচনা করিব। রোমে কিন্তু বিদেশী লোককে এক ইঞ্চি ভূমিও দেওয়া হইত না। কালিকাটের জামরিনের প্রতি পর্ত্তুগীজগণের বিশ্বাসঘাতকতার বিবরণ পাঠ করিলে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতি ঘৃণা বই কোনো শ্রদ্ধার ভাব মনে স্থান পায় না। হিন্দুর ধর্ম্ম তাঁহাকে বিশ্বের সহিত মৈত্রীভাব-পোষণে প্রোৎসাহিত করে এবং এই বিশ্বাসেই হিন্দু আজও ঠকিতেছে, কেননা হিন্দু এই ঠকাকে গ্রাহ্য করে না।

ইউরোপে যে ভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য Socrates এর সময় হইতে সাধিত হইতেছে, তাহাতেই ইউরোপ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। তৎপূর্ব্বে গ্রীসে ও রোমে ব্যক্তি রাষ্ট্রের অংশরূপে রাষ্ট্রের নিয়ম-কানুন মানিয়া যন্ত্রবৎ পরিচালিত হইত। আমাদের দেশে শাস্ত্রের শাসনে মানুষ যন্ত্রবৎ পরিচালিত হইয়াছে। ইউরোপের ইতিহাসে Socratesই প্রথম বলেন যে, ব্যক্তির একটা আত্মিক মঙ্গল আছে, তাহা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। Sophoclesএর নাটক Antigoneতেও এই ভাবের একটা নীতি শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। নায়িকা Antigone বলিতেছেন যে, তাঁহার হৃদয়ে যে সত্য তিনি বুঝিয়াছেন, তাহার আদেশ রাজার আদেশের অপেক্ষা বরণীয়, কাজেই তিনি রাজার আদেশ অগ্রাহ্য করিয়াছেন। সক্রাতিশও এই ভাবে যুবকদিগকে আত্মার মঙ্গলের দিকে মনোযোগ দিতে শিক্ষা দেন ; এই শিক্ষাই stoicদের নিকট পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ইউরোপীয় conscience-বাদ বা বিবেক-বাদরূপে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ভিত্তি গড়িয়া দিয়াছে। যিশুর ধর্ম্মও এই শিক্ষাকে পুষ্ট করিয়া নরনারীগণকে ব্যক্তিত্ব-প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিয়াছে, যদিও পরে পোপগণ এবং রাষ্ট্রের পরিচালকগণ নানা ভাবে এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে ব্যাহত করিয়া বাধা দিতেছেন। আজকাল ত dictatorগণ steam rollerএর ন্যায় ব্যক্তিকে নিষ্পেষণ করিয়া দিতেছেন। আমাদের দেশেও শাস্ত্র, গুরু, সমাজ প্রভৃতি ব্যক্তিকে নিষ্পেষণ করিয়াছেন, কিন্তু নৈতিক বিষয়ে ও পাপপুণ্য-বিচারে যে কতকটা স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। আত্মদমনে ও রিপুর শাসনকার্য্যে যে ব্যক্তির স্বাধীনতা রহিয়াছে, তাহা ত স্বীকার করা হইয়াছে। "আপদঃ কথিতঃ পন্থা ইন্দ্রিয়াণামসংযমঃ। তজ্জয়ঃ সম্পদাং মার্গো যেনেষ্টং তেন গম্যতাম্।" ইহাতে ব্যক্তির আত্মদমনে সামর্থ্য ও স্বাধীনমনোবৃত্তি স্বীকার করা হইল। "একঃ প্রজায়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে। একোঽনুভুঙ্‌ক্তে সুকৃতমেক এব চ দুষ্কৃতম্।" ইহাতে আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ পাপপুণ্যের ফলভোগী, এই কথা স্বীকৃত হইল। প্রত্যেক হৃদয়ে "পুণ্যপাপেক্ষিতা মুনিঃ" একজন চুপ করিয়া দেখিতেছেন, আমরা যাহা করি। ইহাতে ব্যক্তিকে গোপন-পাপ-সম্বন্ধেও সাবধান করা হইল। তথাপি পরিবারবন্ধন এদেশে দৃঢ় থাকাতে ব্যক্তিত্বটা সাংসারিক বিষয়ে বিশেষ স্বীকৃত হয় নাই। নৈতিক দায়িত্ব ব্যক্তির স্বীকার করা হইয়াছে, তথাপি "Fathers have eaten sour grapes, therefore children's teeth are set on edge" অর্থাৎ পিতৃপিতামহগণ পাপ করিয়াছেন, তাহাতে সন্তান-সন্ততির দণ্ড হয়, একথা একেবারে অস্বীকার করা হয় নাই। পিতৃপুণ্যে সন্তানের মঙ্গললাভ হয়, একথা আমরা বিশ্বাস করি ; কিংবা সন্তান পাপ করিলে পিতৃলোক ভয় পান, এই বিশ্বাসও আছে। সম্পত্তিতে পরিবারের যেরূপ সকলের অংশ রহিয়াছে, পাপপুণ্যেও সকলের অংশ প্রাপ্য, এই বিশ্বাস একেবারে নাই, বলা যায় না। স্ত্রীর পুণ্যে স্বামীর ভাগ আছে এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়ে একসঙ্গে ধর্ম্মের অনুশীলন করিবেন—এই ভাবে পারিবারিক জীবনকে আধ্যাত্মিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করায় স্থায়িত্ব-লাভের দিকে উপকার হইয়াছে।

ব্যক্তিত্ব লোককে স্বার্থপর করে, যদিও স্বাবলম্বন শিক্ষা দিয়া মনুষ্যত্ব-লাভের সহায় হয়। ইউরোপের নরনারীগণ তজ্জন্য আত্মনির্ভরশীল, উদ্যমপূর্ণ ও স্বার্থান্বেষী। আমাদের সমাজে নানারূপ শাসন বশতঃ, ব্যক্তিত্ব এই ভাবে বিকশিত হয় না। ধর্ম্মে অবশ্য একটা স্বাধীনতা পরে দেওয়া হয়। আশ্রম-বিভাগ দ্বারা জীবনের শেষ অবস্থায় ধর্ম্মসাধনে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করা হইয়াছে। "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্," মহাভারত এই সত্য স্বীকার করিয়াছেন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ইউরোপে প্রবল থাকাতে তাঁহাদের সমাজে, রাষ্ট্রে ও শিল্পব্যবস্থায় সর্ব্বত্রই উন্নতিলাভ হইয়াছে। তাঁহারা সেই উন্নতিরই গৌরব করেন। আমরা বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেরা এই ব্যক্তিত্ব লাভ করিতেছি, কিন্তু ইহাতে সকল প্রকার মঙ্গল লাভ হইতেছে কিনা, বলা কঠিন। ঐহিক উন্নতি-লাভে এই ব্যক্তিত্বের উপকারিতা রহিয়াছে সত্য, কিন্তু ইহাতে পারিবারিক জীবনে পূর্ব্বের ন্যায় আত্মবিলোপকারী সেবাকার্য্য বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে।

Milton এর Satanএ যে ভাবের ব্যক্তিত্ব দেখা যায় সেই ভাবের ব্যক্তিত্বই ইউরোপীয় সমাজে প্রাচীন সময় হইতে বিকশিত হইতেছে। Achilles, Alexander, Cromwell, Napoleon প্রভৃতি নেতৃবৃন্দে ইচ্ছাশক্তির প্রবল প্রতিষ্ঠা দেখা যায়, ইহা অহঙ্কারের নামান্তর। আমাদের পুরাণবর্ণিত হিরণ্যকশিপু প্রভৃতিতে ঈশ্বরকে অস্বীকার করা ও নিজের ব্যক্তিত্ব প্রখ্যাত করার চেষ্টা এইরূপ ইচ্ছাশক্তি বা will power এর কার্য্য। আমাদের নীতির উচ্চ আদর্শ এইরূপ ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ নয়, ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে মানুষের ইচ্ছাকে মিলিত করিয়া ভগবানে কর্ম্মার্পণ করাই আদর্শ। এই ভাবের ইচ্ছাশক্তিই জগতের উপকারে আসে। Napoleon প্রভৃতিরও ইচ্ছাশক্তি যখন লোক-শ্রেয়ঃসাধনে নিযুক্ত হইয়াছে, তখনই তাহার ফল ভাল হইয়াছে। ব্যক্তিত্বের আদর্শ ইউরোপে ও এদেশে ঠিক এক নহে। এখানে অর্জুনের ন্যায় জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে কার্য্য করাই আদর্শ, ইউরোপে এই আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই, যদিও stoic প্রভৃতি লোক-শিক্ষকগণ নিষ্কাম ধর্ম্মের আদর্শের কথা বলিয়াছেন। এদেশে আজও আমাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রাচীন আদর্শই জীবনে মূর্ত্ত করিতে প্রয়াস পান। যাঁহারা ইউরোপীয় ব্যক্তিত্বের প্রশংসা করেন, তাঁহাদিগকে বলিতে চাই যে, Wordsworth যে Heroism এর কথা তাঁহার Happy Warriorএ লিখিয়াছেন, তাহা ইউরোপে স্থান পায় নাই ; তাহা গীতার আদর্শের ন্যায়, এবং এদেশে তাহা প্রতিষ্ঠিত আছে।

H. G. Wells তাঁহার প্রসিদ্ধ ইতিহাসে স্বীকার করিয়াছেন যে, এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও Nationএর স্বাতন্ত্র্য ইউরোপকে ব্যতিব্যস্ত করিতেছে এবং তাহার ফলে পরিবারে, কারখানায় রাষ্ট্রে ও আন্তর্জাতিক বৈঠকে সর্ব্বত্র অশান্তি দেখা দিয়াছে। কোথাও কেহ আত্মবিলোপ করিতে রাজী নয়। স্বামী-স্ত্রীতে ছাড়াছাড়ি ঘটিতেছে ; সন্তানগণ মাতাপিতাকে গ্রাহ্য করে না, শ্রমিকগণ প্রভুকে জব্দ ও হৃতসর্ব্বস্ব করিতে ছাড়ে না, রাষ্ট্রে ত নিয়ত বিবাদ চলিতেছে। আমরাও এখন এই ব্যক্তিত্বের ঝড়ের মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি। সর্ব্বত্রই অশান্তি প্রসার-লাভ করিতেছে।

হিন্দু-সভ্যতা গড়িয়াছে গ্রামে ও আশ্রমে। এখনও শতকরা ৯৫ জন লোক ভারতের সাড়ে সাত লক্ষ গ্রামেই বাস করিতেছে। কাজেই ইউরোপীয় সভ্যতা হইতে ইহার পার্থক্য রহিয়াছে। ইউরোপীয় সভ্যতার সূত্রপাত গ্রীসের ও রোমের সহরে, তাহাতেই তাঁহাদের মধ্যে স্বাধীনতার আদর্শ বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য এত প্রবল হইয়াছে। সহরের লোক বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান্ ও সাহসী। তাঁহারা সতত সুখ-সুবিধা ও আনন্দ খুঁজেন। গ্রামে

(২) ইতিহাসের ধারা

ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের ধারাটী না বুঝিলে ভারতীয় সভ্যতার প্রকৃতি বুঝা যাইবে না এবং এই ইতিহাসের ধারা বুঝিবার জন্য নিম্নলিখিত কতিপয় ঐতিহাসিক তত্ত্বও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। মহামতি কার্লাইল বলিয়াছেন "Happy is the country that hath no history" অর্থাৎ যে দেশের ইতিহাস বিশেষ কিছু নাই, সেই দেশবাসিগণ সুখী, কেননা ইতিহাসে দ্বন্দ্ব-কলহই লিখিত হয় এবং দ্বন্দ্ব-কলহ না থাকিলে বিশেষ কিছু লিখিবার থাকে না।* আর একটা কথা Solomonএর wisdom নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, তাহাও মনে রাখা দরকার—"A live dog is better than a dead lion" একটী জীবন্ত কুকুর একটী মৃত সিংহ অপেক্ষা ভাল, কেননা জীবন্ত কুকুরের মধ্যে কিছু শক্তি আছে এবং তাহার আশাও আছে। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা আজও জীবিত রহিয়াছে, কাজেই তাহার উন্নতির আশা করা যাইতে পারে। যে সকল সভ্যতা ভূগর্ভে প্রোথিত বা লোকলোচনের অগোচর হইয়া স্মরণের বিষয় মাত্র হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের গুণসমূহ দ্বারা আমরা উপকৃত হইতে পারি, কিন্তু সেই সকল সভ্যতা মৃত। Frederick Harrison এক জন সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিত, তিনি বলেন যে ইতিহাসে শুধু কতকগুলি ঘটনার বর্ণনা করা হয়, তজ্জন্যই ইহা মূল্যবান্ নহে, কেননা একটা Postal Guideএ যথেষ্ট সত্য ঘটনা বা facts থাকে। যে সব ঘটনা দ্বারা মানবচরিত্রের উৎকর্ষ লাভ হইতে পারে, যাহা হইতে আদর্শ লাভ করিয়া মানুষ চরিত্র গঠন করিতে পারে এবং যে সব ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণ পাঠ করিলে মানব-সমাজের ক্রমবিকাশতত্ত্ব বুঝা যাইতে পারে, এবংবিধ ঘটনাই ইতিহাসে বিবৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়। Frederick Harrisonএর মতানুযায়ী প্রকৃত সত্য আমাদের পুরাণাদিতে ও ধর্ম্মগ্রন্থসমূহে পাঠ করা যায়। কাজেই ভারতবর্ষের ইতিহাস ধর্ম্মগ্রন্থাদিতে, বেদ, পুরাণ, স্মৃতি ও কাব্যসমূহে কিছু কিছু পাওয়া যায় এবং তাহা হইতে চরিত্রের আদর্শ কি হওয়া উচিত এই জ্ঞান লাভ করা যায় এবং মানব-সমাজের পরিবর্ত্তনের ধারাও বুঝা যায়। বিশেষতঃ ভারতবর্ষের ইতিহাস দ্বন্দ্ব-কোলাহলের ইতিহাস নহে, ভারতবর্ষের ইতিহাস তাহার আধ্যাত্মিক পরিবর্ত্তন ও উন্নতিলাভের ইতিহাস।—এই কথা Vincent Smith বলিয়াছেন। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকেরাও বলেন যে ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়া যদি মানবসমাজ ও শাসনবিধান-সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে, তবে ইতিহাস-পাঠ সার্থক, নতুবা বৃথা শ্রম। বেকন তজ্জন্য বলেন "History maketh man wise" ইতিহাস পাঠ করিলে জ্ঞানী হওয়া যায়। কাজেই ভারতবর্ষের ইতিহাস নাই বলা ঠিক নহে। ভারতবর্ষের ইতিহাস বিস্তৃতভাবেই লিখিত আছে এবং পুরাণপাঠ ধর্ম্মানুশীলনের মধ্যে আজও পরিগণিত হয়। Thucydidesএর যে ইতিহাস আদর্শস্থানীয় মনে করা হয়, তাহাও গ্রীক্ সভ্যতার প্রকৃতি বুঝাইয়া দেয়, তাই তাহার আদর। জীবন-চরিত, ইতিবৃত্ত বা ইতিহাস এদেশে ধর্ম্মশাস্ত্ররূপেই পঠিত হইয়া থাকে।

* তিনি এই সত্যটী একটী উদাহারণ দ্বারা পরিষ্কার করিয়াছেন। ক্ষুদ্র acorn বা ওকবীজটী যখন প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হয়, তখন তাহার খোঁজ কেহ করে না, প্রকৃতি তাঁহার কার্য্য নীরবে সম্পাদন করেন। কিন্তু যখন এই প্রকাণ্ড ওক বৃক্ষটী ছেদন করা হয়, তাহার পতন-শব্দে পৃথিবী মুখরিত হয়। সেই ভাবেই নীরবে আমাদের সভ্যতা, বিশেষত: ইতিহাসের ধারা চলিয়াছিল দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত।

স্মরণাতীত কাল হইতেই ভারতবর্ষ বহু রাজ্যে বিভক্ত। বৈদিক সময়েও বহু রাজা এবং ঋষিবংশ সমাজের শাসন-ব্যবস্থার জন্য দায়ী ছিলেন। কেবল রামায়ণ এবং মহাভারতে আমরা একচ্ছত্র রাজচক্রবর্ত্তীদিগের বিষয় পাঠ করি। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, রামচন্দ্র বা যুধিষ্ঠির আজকালের সংজ্ঞা অনুসারে সম্রাট্ ছিলেন না; তাঁহারা সমাজপতি-রূপেই সম্মানিত হইতেন। এদেশে রাজা রাজ্য শাসন করিবেন ধর্ম্মানুমোদিত ভাবে এবং প্রজারও ধর্ম্ম ছিল রাজার আজ্ঞাপালন। রাজধর্ম্ম ও প্রজাধর্ম্ম এক ভাবেই শাস্ত্রানুমোদিত ব্যবস্থা। দুষ্ট রাজা যে সিংহাসন-বিচ্যুত না হইয়াছেন, তাহা নহে। মনুসংহিতাতে বেণ নামক রাজার সিংহাসন-বিচ্যুতির বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহাকে ইংলণ্ডাধিপতি প্রথম Charles বা ফরাসী রাজা ষোড়ষ লুই-এর ন্যায় বধ করা হয় নাই, এদেশের লোকেরা ঐরূপ হিংসাপ্রবণতা হইতে মুক্ত ছিলেন। এখানে প্রতিহিংসা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপ্রবৃত্তি ধর্ম্মের বিধানকে একেবারে অস্বীকার করিতে সাহস করে নাই। রোমকেরা যে ভাবে কার্থেজ নগর বা গ্রীকেরা যে ভাবে ট্রয় ধ্বংস করেন, এদেশের পুরাণে এইরূপ হিংসার বিবরণ বিশেষ নাই।* ঐতিহাসিক যুগেও এইরূপ অমানুষিক শত্রুতার কাহিনী পাওয়া যায় না। "রাজতরঙ্গিণী" গ্রন্থে কাশ্মীরের কয়েকজন রাজার ক্রূরতা ও স্বার্থান্ধতার বিবরণ লিখিত আছে। এইগুলি অধঃপতনের সময়ে ঘটিয়াছিল। পুরাণেও কংশ, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি ধর্ম্মবিহীন রাজার বিবরণ পাঠ করি, তথাপি রাজন্যবর্গের অধিকাংশ যে প্রজাপালক ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে সব "শোষণকারী" রাজা ঐতিহাসিক যুগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারা ধর্ম্মবিহীন বলিয়াই ধরিতে হইবে। আজকাল যেমন রাজ্যশাসন আর ধর্ম্মকার্য্য নহে, পরন্তু লাভের কার্য্য, পূর্ব্বের মনোভাব সেইরূপ ছিল না। রাজ্য রক্ষা করা ও প্রজা পালন করা বিশেষ কঠিন সমস্যা। তজ্জন্য এই সম্বন্ধে বহু শাস্ত্র ও বহু বিধি প্রণয়ন করা হইয়াছে। বৌদ্ধযুগেও প্রজাতন্ত্র এবং গণতন্ত্র-প্রণালীতেও বহু রাজ্য শাসিত হইয়াছে। সেকেন্দর যখন খৃষ্টপূর্ব্ব ৩২৬ অব্দে ভারত আক্রমণ করেন, তখন উত্তরভারতে কোন কোন ক্ষুদ্ররাজ্যে গণতন্ত্র প্রবর্ত্তিত ছিল এবং বৈদিক সময়েও কোন কোন ঋষিবংশ পরস্পরের সহিত মিলিতভাবে সমাজরক্ষার বিধান করিয়াছেন, মনে হয়। কালক্রমে বর্ণবিভাগ করিয়া বৃত্তিবিভাগ করিলে কার্য্যের সুবিধা হইবে, ইহা তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন। তজ্জন্য রাজ্যপালনের নিমিত্ত সাহসী, যুদ্ধনিপুণ লোকেরা নির্দ্দিষ্ট হইলেন। এখনও ত সকলে যুদ্ধ করিতে পারি না। মানুষের মধ্যে যে শক্তির পার্থক্য আছে, তাহা বুঝিয়াই বৃত্তি নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল।

এই সম্বন্ধে আর একটী কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। Prof. Wilson James Mill এর ইতিহাসে এই সত্যটী স্বীকার করিয়াছেন। এদেশে Executive এবং Legislative function পৃথক্ ছিল। ঋষিগণ ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতেন এবং রাজন্যবর্গ তাহার প্রয়োগ করিতেন। একজনই fountain of law এবং fountain of justice ছিলেন না। রাজা নিজের স্বার্থ বজায় রাখার সুযোগ পাইতেন না, ধর্ম্মরক্ষার জন্যই নিযুক্ত হইতেন। ইউরোপের ইতিহাসে ব্রাহ্মণ্য শক্তি ও ক্ষাত্রশক্তি পরস্পরের বিরোধী। রাজারা ধর্ম্মবিষয়েও কর্ত্তৃত্ব করিয়াছেন এবং শাসনশক্তিও পরিচালনা করিয়াছেন। পোপগণও ধর্ম্মবিষয়ে নিয়ন্তৃত্ব করিতেন এবং রাজ্যশাসনও করিতেন। ইহাতে ধর্ম্মশিক্ষা এবং রাজ্যরক্ষা উভয় কার্য্যই

* রামচন্দ্র রাবণকে নিহত করিয়া বিভীষণকে রাজা করিলেন এবং তৎপর বিভীষণের অনুমতি লইয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন।

ধর্ম্মানুমোদিত ভাবে সম্পন্ন হইতে পারে নাই। ধর্ম্মশিক্ষকেরাও স্বার্থান্ধ এবং শাসনকর্ত্তারাও স্বার্থান্ধ, রাজশক্তি ও আধ্যাত্মিক শক্তি অনেক সময়ে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী এবং শত্রুভাবাপন্ন। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে church এবং stateএর এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রজাদের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। ধর্ম্মবিষয়ে তাহারা নিঃস্বার্থ লোকের সেবা হইতে বঞ্চিত, ঐহিক বিষয়েও স্বার্থপর রাজন্যবর্গের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াছে। আজ যে ইউরোপে ধর্ম্মের গ্লানি হইতেছে, এবং লোকেরা ধর্ম্মব্যবস্থা তুলিয়া দিতে চাহিতেছে, তাহার কারণ দেড়হাজার বৎসর যাবৎ তাহারা ধর্ম্মের নামে স্বার্থান্ধ পুরোহিতবর্গ ও রাজন্যবর্গ দ্বারা নানাভাবে উৎপীড়িত হইয়াছে। খ্রীষ্টশিষ্য যাজক-সম্প্রদায় খ্রীষ্টের সন্ন্যাস ও ত্যাগকে আদর্শ করিয়া উঠিতে পারেন নাই।—Elphinstone তাঁহার ভারতবর্ষের ইতিহাসে মুসলমানগণের ভারতে ধর্ম্মপ্রচার-সম্বন্ধে লিখিতে যাইয়া ইহা স্বীকার করিয়াছেন। পারস্য দেশের সকল লোক মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিল, কিন্তু ভারতবর্ষে মুসলমানগণের ধর্ম্ম অল্পলোকেই গ্রহণ করিল। ইহার কারণ তিনি এই ভাবে নির্দ্দেশ করেন:—মুসলমান ধর্ম্মে এমন কোন নূতন কথা ছিল না, যাহা ভারতে অজ্ঞাত ছিল এবং এই দেশের ধর্ম্মযাজকেরা ধর্ম্মযাজন এইরূপ ভাবে করিতেন যে, তাঁহাদের প্রতি লোকেরা শ্রদ্ধাশীল ছিল। যে কোন ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত হয় ধর্ম্মশিক্ষকগণের জীবন দ্বারা। এদেশের ব্রাহ্মণেরা দারিদ্র্য বরণ করিয়া জ্ঞানের সাধনায় ধার্ম্মিক জীবন যাপন করিয়াছেন বলিয়াই ধর্ম্ম রক্ষা পাইয়াছে। ক্ষমতালোভী, স্বার্থপর, চরিত্রহীন ও রাজ্যলোভী যাজকগণ ইউরোপে প্রকৃত ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে পারেন নাই। আজকাল অবশ্য দেখিতেছি স্বার্থান্ধ হিন্দু ও মুসলমান নেতৃবৃন্দ স্বার্থের জন্য দল গঠন করিতেছেন, ইহাতে ধর্ম্ম এবং স্বার্থ উভয়ই নষ্ট হইতেছে।

এদেশে ক্ষাত্রশক্তি ব্রাহ্মণ্যশক্তির দ্বারা পরিচালিত হওয়াতে ধর্ম্ম রক্ষা পাইয়াছিল। নিঃস্বার্থ ঋষিগণ যথাসম্ভব সমাজের হিতকামনা দ্বারাই পরিচালিত হইতেন, তাই আজও তাঁহাদের ব্যবস্থা অনেক বিষয়েই অনতিক্রমণীয় হইয়া রহিয়াছে। তাঁহারা ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন, এবিষয়ে সন্দেহ থাকিলেও তাঁহারা যে আত্মিক মঙ্গলের জন্য অধিক ব্যস্ত ছিলেন, তদ্বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। তাঁহাদের ব্যবস্থার দেশকালানুযায়ী কিছু কিছু পরিবর্ত্তনও অনেকে স্বীকার করিতেছেন, তবুও তাঁহাদের মনোবৃত্তি ও দৃষ্টান্ত আমাদের অনুকরণীয়। যে সকল স্বার্থান্ধ ও পরকালবিহীন লোক দল পাকাইয়া শ্রেণী-বিদ্বেষের ফলস্বরূপ শাসন-ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতেছেন, তাঁহাদের এই সকল প্রাচীন ব্যবস্থাকারকগণের উদাহরণ স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। এদেশের মুসলমান রাজন্যবর্গের মধ্যেও কোরাণের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল এবং তাঁহাদের অনেকে ধার্ম্মিকও ছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের শাসন কতকটা স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছিল। বিদ্রোহের ভয় হিন্দু রাজাদেরও ছিল; মুসলমান শাসকগণও প্রজাবিদ্রোহ বর্জন করিতেই প্রয়াস পাইতেন। তাঁহারাও ধর্ম্মযাজকগণের উপদেশ মানিয়া চলিতেন। মুসলমানগণের মধ্যে যাজক-সম্প্রদায় বা church গড়িয়া উঠে নাই সত্য, এবং তজ্জন্য একই লোক ধর্ম্ম-বিষয়ে এবং শাসন-বিষয়ে কর্তৃত্ব করিয়াছেন। তাই লোকের ধর্ম্মবিশ্বাস অধিক পরিমাণে কোরাণদ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে এবং শাসন-বিষয়েও কোরাণের নির্দ্দেশ সম্ভবমত পালন করা হইয়াছে। তাই আজও মুসলমান-শাসিত রাজ্যসমূহে অধিক একতা দৃষ্ট হয়। খৃষ্টান শাসকগণের প্রজাগণের মধ্যে নানা কারণে এইরূপ একতা কখনও প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

এদেশে "রাম-রাজ্য" বা Kingdom of God কেবল কথার কথা ছিল না। প্রজা-পালনই ছিল রাজার ধর্ম্ম। ছান্দোগ্যোপনিষদে একজন রাজা বলিতেছেন, "আমার রাজ্যে পরস্বাপহারী নাই। অদাতা নাই, মদ্যপ নাই, অনাহিতাগ্নি নাই, অবিদ্বান্ নাই, স্বেচ্ছাচারী

নাই, স্বেচ্ছাচারিণী নাই।" এই বিবরণটী নিতান্ত কাল্পনিক বলিয়া মনে হয় না। যে ভাবে ইহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে ইহা একটী সত্য বিবরণ বলিয়াই মনে হয়।

মৌর্য্য বা গুপ্ত সম্রাট্‌গণের যে বিবরণ ইতিহাসে ইউরোপীয় লেখকগণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে উপরিলিখিত বিবরণটী নিতান্ত কাল্পনিক বিবেচিত হইবে না। কালিদাসের কাব্যে রঘুবংশীয়দের যে বিবরণ পাঠ করি, তাহাও নিতান্ত কল্পনাপ্রসূত নহে। কালিদাস যে বিবরণ রামায়ণে পাঠ করিয়াছিলেন ও যাহা তাঁহার অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছিলেন, তাহা অবলম্বন করিয়াই বলিয়াছিলেন—"প্রজানামেব ভূত্যর্থং স তাভ্যো বলিমগ্রহীৎ। সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসং রবিঃ।" প্রজাগণের মঙ্গলের জন্যই তিনি (রঘুবংশীয় রাজা) কর আদায় করিতেন, এবং সূর্য্য যেমন গৃহীতজল সহস্রগুণে প্রত্যর্পণ করেন, তিনি তাহাই করিতেন। মেগাস্থিনিসের লিখিত মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের সুখশান্তির বিবরণ ত কাল্পনিক নহে, তাহার অনুরূপ বিবরণ পৃথিবীর ইতিহাসে দুর্লভ। যে Age of the Antonines এর গৌরব Gibbon তদীয় "রোমের পতন" নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতেও ধর্ম্ম এবং নীতি এই ভাবে প্রবর্ত্তিত ছিল না। তিনি শান্তি ও সম্পদেরই বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। ধার্ম্মিক অশোকের রাজত্বে নীতিরক্ষা ও নীতিশিক্ষার যে ব্যবস্থা দেখা যায়, তাহা ত জগতে অতুলনীয়। অশোক তদীয় পিতামহ চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যের রক্ষা ও উন্নতি বিধান করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতামহও ধার্ম্মিক ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত শেষ জীবনে জৈন ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আশ্রমবাসী হইয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। অশোক রাজ্য-শাসন ও ধর্ম্ম-প্রচার উভয় কার্য্যই এক ধর্ম্মভাবে প্রণোদিত হইয়া সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। কাজেই বলিতে হয় যে এদেশে "রামরাজ্য" একটা কাল্পনিক আদর্শ ছিল না। H. G. Wells যে দুঃখ করিয়াছেন Kingdom of God ইউরোপে সম্ভবপর হয় নাই এবং হবেও না, তাহা এই দেশে সম্ভবপর হইয়াছিল এবং আজও হইতে পারে, কেননা সেই মনোবৃত্তি-লাভ অসম্ভব কল্পনা নহে। আমাদের দেশী রাজন্যবর্গ যদি আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থে বর্ণিত আদর্শ অনুসারে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েন এবং প্রজার পালন, শোষণ নহে, কি ভাবে করা যাইতে পারে তদ্বিষয়ে উপদেশ লাভ করেন, তাহা হইলে এই অহিংস দেশে এই আদর্শ-প্রতিষ্ঠা অসাধ্য-সাধন নহে। এদেশের হিন্দু-মুসলমান যদি স্বার্থান্বেষিগণকর্ত্তৃক কুপথে পরিচালিত না হয়েন তাহা হইলে আজও পরকালে বিশ্বাস করেন এবং তজ্জন্য অধর্ম্ম করিতে ভয় পান।

আরবের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্রথম চারিজন খলিফার যুগকেও একটী স্বর্গরাজ্য বলিয়া বর্ণনা করা হয়, কেননা তখন হজরত মহম্মদের শিষ্যগণ ধর্ম্মবিশ্বাসে প্রণোদিত হইয়া নীতিমার্গানুসরণ করিতেন। তাঁহাদের গবর্ণমেন্টের কোষাগারে কোন পাহারার বন্দোবস্ত ছিল না, কেননা সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি কেহ হরণ করিবে না এই বিশ্বাস দ্বারা সকলে অনুপ্রাণিত ছিলেন। পরস্পরের সঙ্গে তাঁহাদের ব্যবহারও ভ্রাতৃভাবাপন্নই ছিল, তথাপি এই যুগকে ছান্দোগ্যোপনিষদের যুগের সহিত তুলনা করা যায় না, আরবেরা অমুসলমানদিগের সহিত লড়াই করিতে বাধ্য ছিলেন। কেননা আত্মরক্ষা ও রাজ্য-বিস্তৃতির জন্য তাঁহাদের পক্ষে যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল। তখনকার প্রচলিত যুদ্ধের নিয়মানুসারে তাঁহারা বিজিত-গণের ধনলুণ্ঠন ও বিজিতগণকে দাসত্বে পরিণত করিয়াছেন। স্বর্গরাজ্যে এবংবিধ শত্রুতা কল্পনা করা যায় না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এদেশের লোকের মধ্যে লুণ্ঠনের প্রবৃত্তি বিশেষ ছিল না। সুতরাং যে কোন সুশাসিত রাজ্য অপেক্ষা এদেশীয় হিন্দুরাজত্বে ধনপ্রাণ অধিক নিরাপদ্ ছিল। গুপ্তবংশীয় রাজাদের রাজত্বকাল খৃষ্টীয় ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দী। এই যুগ আমাদের বিশেষ গৌরবের বস্তু। ইতিহাসে ইহাকে হিন্দু রেণেশাঁস বা হিন্দু আদর্শের নবজীবন-লাভের কাল বলা হইয়াছে। এই সময়ে হিন্দুগণের মধ্যে সর্ব্বতোমুখী

উন্নতি-লাভের বিশেষ প্রচেষ্টা দেখা যায়। গুপ্ত সম্রাট্‌গণ যেমন শৌর্য্যবীর্য্যে খ্যাতি লাভ করেন, তদ্রূপ কৃষ্টি-বিষয়ে তাঁহাদের বিশেষ মনোযোগ ছিল। এই সময়েই বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, নালন্দা, তক্ষশিলা, বিক্রমশিলা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুপ্রকারের জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনা হইত। হিউ এন সাং নামক চৈনিক পরিব্রাজক ৬৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৬৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এদেশে বাস করিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব গ্রন্থে ভারতে জ্ঞানের সমাদর-সম্বন্ধে যে বিবরণ তিনি লিখিয়াছেন, তাহা অন্যত্র পাওয়া যাইবে না। বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণের মধ্যে যদিও ধর্ম্মভাব ম্লান হইতেছিল, তথাপি জ্ঞানালোচনায় তাঁহাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল এবং লোকেরাও অর্থাদি-প্রদানে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিত। এদেশে আজও বিদ্যোৎসাহী ধনী লোকেরা আছেন এবং যদি আমরা তাঁহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারি, তাহা হইলে বিদ্যাচর্চার জন্য অর্থের অভাব হয় না। গুপ্তরাজাদের রাজত্বকালে সংস্কৃত সাহিত্যের ও শিল্পকলার বিশেষ উন্নতিলাভ হয়। এই সম্বন্ধে পৃথক্ গ্রন্থাদি লিখিত হইয়াছে। আমি শুধু এইটুকু বলিয়া নিরস্ত হইতেছি যে এদেশে হিন্দু রাজারা প্রজাপালক ছিলেন এবং দেশের উন্নতির জন্যও চেষ্টা করিতেন। সমুদ্র গুপ্তকে হিন্দু নেপোলিয়ন বলা হইয়াছে, কেননা তিনি Napoleon-এর ন্যায় বীরভাবাপন্ন, বিজয়ী এবং কলাবিদ্‌ও ছিলেন, নিজে সঙ্গীত-শাস্ত্রেরও আলোচনা করিতেন এবং ভারতবর্ষে একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করিয়া ভারতের একতা সম্পাদন করেন। তাঁহাদের পরবর্ত্তী রাজা হর্ষবর্দ্ধনেরও বিশেষ খ্যাতি রহিয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে বাণভট্টের লিখিত "হর্ষচরিত" নামক সংস্কৃত ইতিহাস সুধীসমাজে বিশেষভাবে আদৃত। পুরাণে বর্ণিত মিথিলাধিপতি জনক, অজাতশত্রু প্রভৃতি রাজাদের ন্যায় জ্ঞানী, ধার্ম্মিক ও বিদ্যোৎসাহী রাজারা আজও ভারতীয় রাজ্যসমূহের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেছেন। বৃহদারণ্যকে জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে ব্রহ্মজ্ঞান-সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন এবং সন্তোষজনক উত্তর পাইয়া বলিতেছেন, "আমি আপনাকে হস্তিতুল্য সহস্র বৃষভ দান করিতেছি।" পুরাণ পাঠ করিলেই এদেশের শাসনের ধারা বুঝা যায়। এখানকার লোকেরা ভোগ করিয়াছেন ত্যাগের জন্য। মহাভারতে এই তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে যে "ভোগেই ভোগের বিরতি আসে।" প্রবৃত্তির পথে চলিয়া নিবৃত্তিমার্গে যাইতে হয়, তাই রাজারাও পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া প্রব্রজ্যাগ্রহণ-পূর্ব্বক ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতেন। কালিদাস রঘুবংশীয়দিগের বর্ণনায় লিখিয়াছেন, "যোগেনান্তে তনুত্যজাম্।" তাঁহারা যখন দান করিতেন তখন রিক্তহস্ত হইতে ভয় পাইতেন না। হর্ষবর্দ্ধনের দানের কথা ত ঐতিহাসিক সত্য, কল্পনা নহে। বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়া তাঁহারা যে যাহা চাহিত দিয়া দিতেন। আমাদের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পিতা শ্রীমন্ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীতেও এইরূপ বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনুকরণ দেখা যায়। একদিন তিনিও যে যাহা চাহিল দিয়াছিলেন। এদেশে ধনকে যে "লোষ্ট্রবৎ" দেখা হইয়াছে, তদ্বিষয়ে বিশেষ বলার প্রয়োজন নাই। এজন্য communism এখানে দরকার হয় নাই। আমিই শিশুকালে ধর্ম্মকার্য্যে, শ্রাদ্ধে, বিবাহে, অন্নারম্ভে যে ভাবে বড়লোকদিগকে অর্থব্যয় করিতে দেখিয়াছি, আজকাল তাহা উঠিয়া যাইতেছে। বিধবাদিগকে সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া নিঃস্ব হইতে আজও দেখা যায়, সব সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া তীর্থদর্শনে অনেকে চলিয়া যায়, এবং দুঃখে ভিক্ষা করিয়া দেহ পাত করে। উচ্চনীচ সকলের মধ্যেই অর্থব্যয়ে একটা অসঙ্কোচ মনোভাব ছিল। তাই এদেশের দরিদ্রগণ আজও ভিক্ষা করিতে অসম্মান বোধ করে না, ভিক্ষাবৃত্তি হেয় নহে এবং ভিক্ষাবৃত্তি অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় না, যদিও শাস্ত্রে ভিক্ষার অধিকার সকলকে দেওয়া হয় নাই।

এদেশের প্রজাগণ ছিলেন রাজভক্ত এবং রাজার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা তাঁহাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য হইত না। ইংলণ্ডের ইতিহাসে দেখিতে পাই যে রাজার ত্রুটী প্রজাগণ ক্ষমা করেন নাই। রাজা যখন অন্যায় করিয়াছেন বা রাজকার্য্যপরিচালনে অক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তখন প্রজাগণ নিজেরা শাসনকার্য্যে হাত দিয়াছেন। তাঁহাদের ভাব-ধারাতে এই ভাবে শাসনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করার রীতি প্রাচীন সময় হইতে চলিয়া আসিয়াছে। এদেশে রাজা যখন অপারগ হইয়া রাজ্যরক্ষা করিতে অক্ষম হইয়াছেন, তখন প্রজারা এই বিষয়ে নিরপেক্ষ রহিয়াছে ও অন্য রাজা সিংহাসন অধিকার করিলে তাঁহাকেই কর দিয়াছে। বহু রাজবংশ এদেশে লোপ পাইয়াছে। মুসলমানগণও পরস্পরকে সিংহাসন-বিচ্যুত করিয়াছেন। যিনি সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন, তাঁহাকেই প্রজারা স্বীকার করিয়াছে। মুসলমান-রাজত্ব যখন উঠিয়া গেল, ইংরেজেরা মোগলদের স্থান অধিকার করিলেন, প্রজাগণ এই বিদেশী লোকদিগকেও গ্রহণ করিয়া কুর্নিশ করিল। ইহাতে এদেশী লোকের অপমান-বোধ নাই। ইউরোপীয় লোকেরা যে ভাবে রাজ্যাধিকারের জন্য ব্যস্ত এবং "স্বাধীনতা-হীনতায়" বাঁচিতে চায় না, সেই ভাব এদেশের লোকের মনে আজও বিশেষ নাই; থাকিলে, বিদেশীয়গণের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইত না। Seeley তাঁহার Expansion of England নামক গ্রন্থে পরিষ্কারভাবে বলিয়াছেন যে, "যে মুহূর্ত্তে ভারতের লোকের মনে জাতীয়তার বা স্বাধীনতার ভাব জন্মিবে, সেই মুহূর্ত্তে আমাদিগকে চলিয়া আসিতে হইবে।" তিনি বলেন যে Conquest of India সম্ভব হইয়াছে এই "জাতীয়তা"র বা "স্বাধীনতা-প্রবৃত্তি"র অভাববশতঃ, কেননা ভারতীয় অর্থে এবং ভারতীয় সৈন্যের সাহায্যে ভারত-বিজয় ঘটান হইয়াছে, ইংলণ্ডের লোক ও ইংলণ্ডের অর্থ এই কার্য্যে প্রযুক্ত হয় নাই। "জাতীয়তা"র ভাব বর্ত্তমান না থাকার দরুন এদেশের লোকেরা কখনও একযোগে স্বদেশ-রক্ষার্থে চেষ্টা করে নাই। আজ মৌর্য্যবংশ, কাল গুপ্তবংশ, পরশু অন্ধ্রভৃত্য বা পালবংশ রাজত্ব করিয়াছেন। প্রজাগণ দাঁড়াইয়া রাজপরিবর্ত্তনের তামাসা দেখিয়াছে, এবং পরে অত্যাচারিত ও অবজ্ঞাত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি সকলে একত্র হইয়া দেশ রক্ষা করা যায় কি না, এই কথা ভাবে নাই। জাতিভেদ গঠন করিয়া বৃত্তিভেদ করিয়া দেওয়াতে, সকলে স্ব স্ব বৃত্তির অনুসরণই "ধর্ম্ম" বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। ক্ষত্রিয়গণ রাজ্যরক্ষা করিবেন, যদি না পারেন, সরিয়া পড়িবেন, ইহাতে আমার মাথা-ব্যথার প্রয়োজন নাই, এরূপ একটা মনোবৃত্তি আজও আমাদিগকে ভারতরক্ষাবিষয়ে অমনোযোগীই রাখিয়াছে। এই যে বর্ত্তমান যুদ্ধ চলিয়াছে এবং আমাদের ধনপ্রাণ নষ্ট হইতে পারে, মনে হইতেছে, তাহাতেও আমরা অসাড়ের মতই কোনো সাড়া দিতেছি না এবং শাসনকর্ত্তারাও তজ্জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন মনে হয় না। এই দুর্ব্বলতা আজ "ভেদনীতি"র দ্বারা আরো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। এখন প্রদেশে প্রদেশে প্রতিযোগিতা, হিন্দু-মুসলমানে প্রতিযোগিতা, ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণেতরগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের প্রতিযোগিতা প্রভৃতি কারণ বশতঃ আমাদের নিজের স্বার্থই এখন একমাত্র চিন্তনীয় বিষয়, দেশের মঙ্গল নামক পদার্থটা কাল্পনিক ভাবমাত্রেই রচনার কিংবা কবিতার বিষয় হইয়া রহিয়াছে।

৭১১ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুদেশে মুসলমান-আক্রমণ আরম্ভ হয়, কিন্তু মহম্মদ বিন্ কাশিম উদার ব্যবহার করিয়া, হিন্দুদিগকে বিশেষ ভাবে পর্য্যুদস্ত করেন নাই। কাজেই আরো পাঁচশত বৎসর হিন্দুরা নির্ব্বিবাদেই এদেশে বাস করিয়াছেন, যদিও একাদশ শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশে সুলতান মামুদ চতুর্ব্বিংশতিবার ভারতের বহু সমৃদ্ধ নগরী কনোজ, মথুরা, মুলতান, সোমনাথ প্রভৃতি লুণ্ঠন ও ধ্বংস করেন। তাঁহার সঙ্গেই আলবেরুণী নামক মুসলমান পণ্ডিত আসিয়া

ভারতে বহুবর্ষ বাস করেন, তিনি হিন্দুশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া অতি মূল্যবান্ গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। এই কথার উল্লেখ প্রথম প্রবন্ধে করা হইয়াছে। সুলতান মামুদ যখন পুনঃ পুনঃ ভারত আক্রমণ করিয়া হিন্দুদিগকে লুণ্ঠন ও হত্যা করিতেছিলেন, তখনও হিন্দুদের মধ্যে কোনো প্রকার একতা দেখা যায় নাই। এখন যেমন গ্রামে গ্রামে ডাকাতি হইতেছে, সহরে সহরে লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড চলিতেছে, তখনও মনে হয় এই ভাবেই জীবন চলিয়াছে। আমরা এখন প্রবল-প্রতাপান্বিত গবর্নমেণ্টের অধীনে বাস করিতেছি, তাহাতে ত সন্দেহ নাই, কিন্তু ডাকাতি, লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড ত অবাধে চলিতেছে। কাজেই সুলতান মামুদের সময়ে এক হাজার বৎসর পূর্ব্বে যে লুণ্ঠন চলিয়াছিল এবং তাহা ঠেকান হয় নাই, তজ্জন্য বিস্ময়ের কোনো কারণ নাই। যে ক্রূরতা ও হৃদয়হীনতা সুলতান মামুদের কার্য্যে প্রকাশ পায়, তাহার বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, মনে হয় না। ইউরোপীয় লেখকেরা বিস্ময় প্রকাশ করেন যে বিন্ কাশিমের আক্রমণের পর হিন্দুগণ পাঁচশত বৎসর সময় পাইলেন, তবু তাঁহাদের মধ্যে কোনো জাতীয় চেতনার উদ্রেক দেখা গেল না। সেই চেতনা ত আজও উদ্রিক্ত মনে হয় না। এই অসাড় ভাব কিরূপে দূরীভূত হইতে পারে তাহা চিন্তনীয়। প্রাচীন গ্রীসে বা রোমে এবং বর্ত্তমান সময়ের ইউরোপে রাজনৈতিক স্বাধীনতা যে ভাবে জীবনের প্রধান উদ্দেশ্যরূপে বরণীয় হইয়া রহিয়াছে, সেই মনোভাব এদেশের লোকের মনে স্থান পাইতেছে না। সেইরূপ মনোভাব জন্মিলে বিদেশীয়গণকে সরিয়া যাইতে হইবে।

দ্বাদশ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত মুসলমানগণ এদেশে রাজত্ব করেন। মহম্মদ ঘোরী প্রথম তিরৌরীর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন, কিন্তু বিজেতারা তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিলেন না, অনুসরণ করিলে তাঁহাকে সমূলে ধ্বংস করিতে পারিতেন। কিন্তু মহম্মদ ঘোরীকে বিনষ্ট করিলেই যে ভবিষ্যতে মুসলমানগণ এদেশে প্রবেশ করিতেন না, তাহা মনে হয় না, কেননা তাঁহাদের পৃথিবীজয়ের ইচ্ছা ক্রমশঃ প্রবলতর হইতেছিল এবং মোগল তৈমুরলঙ্গ ও জঙ্গিসখাঁ ত পৃথিবীর অনেকাংশ জয় করিয়াছিলেন। তৈমুরের ভারত-অধিকারের দাবীতেই ত বাবর ভারত-জয়ের জন্য উৎসাহিত হইয়াছিলেন। হিন্দুস্থানের ধনের খ্যাতি পৃথিবীময় ব্যাপ্ত ছিল, কাজেই এই ভোগের আকাঙ্ক্ষা সকলকেই প্রলুব্ধ করিয়াছে। আজ নয় তৈল, কয়লা প্রভৃতি খনিজ পদার্থের প্রতি অধিক মনোযোগ দেখা যায়, তখন মাতা বসুন্ধরার গর্ভনিহিত নিধি অপেক্ষা তাঁহার শরীরাভরণ শস্যাদির ও তদুৎপন্ন সম্পদের জন্য মানুষেরা লালায়িত ছিল। ভোগ-পরায়ণ সভ্য মানুষেরা আজ আরো অধিক লালায়িত। ভারতীয় চরিত্রের দুর্ব্বলতা যে, ইহাতে লোভের প্রাবল্য তেমন স্থান পায় নাই। আজ হয়ত আমরা দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত ও অন্নক্লিষ্ট, এবং অনুচিকীর্ষাবশতঃ বিলাসী হইয়া লোভী হইয়াছি, কিন্তু তথাপি আমাদের বুভুক্ষা আমাদিগকে এত অস্থির করিতে পারিতেছে না। ইউরোপের লোক এই ভাবে দৈন্য এবং উৎপীড়ন সহ্য করিবে মনে হয় না।

মুসলমানগণকে সমবেতভাবে ভারত আক্রমণে বাধা দেওয়া যদিও সমস্ত হিন্দুর পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই, তথাপি সর্ব্বত্রই হিন্দুরা যে বাধা দিয়াছেন এবং মুসলমানেরাও যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারেন নাই, তাহার প্রমাণ আছে। সিন্ধুদেশ আক্রমণকালে তত্রত্য রাজা মহম্মদ বিন্ কাসিমের সহিত লড়াই করিয়া নিহত হন। দিল্লীর অধিপতিও মহম্মদ ঘোরীকে আক্রমণ করিয়াছিলেন; সংগ্রামসিংহও বাবরকে যথেষ্ট শক্তিপ্রদর্শন দ্বারা ভারতবিজয়ে বাধা দিয়াছিলেন; বঙ্গদেশেও আকবরের সেনাপতিগণ বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন; দক্ষিণ ভারতে বিজয়নগরের রাজগণ যে প্রভূত শক্তি-সম্পন্ন ছিলেন ও হিন্দুদিগকে রক্ষা করার জন্যই

রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাও ইতিহাস-পাঠক অবগত আছেন। হিন্দুরা সমস্ত ভারতের লোকদিগকে একদলে আনয়ন করিয়া মুসলমান অধিকারে বাধা প্রদান করিতে পারিয়াছিলেন না বলিয়া ভারতীয়গণকে ইউরোপীয় অনেকে নিন্দা করিয়াছেন, কিন্তু সমস্ত ইউরোপ ত আজও একত্র হইতে পারে নাই, তাঁহারাও ত ক্রুসেডের সময়ে একত্র হওয়ার আবশ্যকতা বোধ করিয়াছিলেন। সমগ্র ভারতে একতা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না, এই একতাসম্পাদন কখন কিভাবে ঘটিবে বলা কঠিন। মুসলমানগণ যখন দ্বাদশ শতাব্দীতে এদেশে প্রভুত্বলাভ করেন, তখন তাঁহাদের রাজ্যশাসনের অভিজ্ঞতা কতক পরিমাণে শিক্ষা হইয়াছিল; তাই তাঁহাদের শাসনক্ষমতা সহনীয় ছিল। আলাউদ্দিন হিন্দুগণের উপরে নানা প্রকার অত্যাচার করিতেন সত্য, কিন্তু তাঁহারও শাসন-বিষয়ে নিপুণতা দেখা যায়। আকবরসাহ যে জমির শ্রেণী-বিভাগ করিয়া রাজস্বের সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী টোডরমল সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। কিন্তু ইতিহাসে দেখা যায় যে, এই ভাবে জমির শ্রেণীবিভাগ প্রভৃতি সুব্যবস্থা আলাউদ্দিনের সময় হইতে আরম্ভ হইয়া সের শাহের সময়ে আরো উন্নতিলাভ করে এবং পরে আকবরের সময়ে ততোঽধিক উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়। ইংরেজ শাসকগণও তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণ করিয়াই এদেশে জমির রাজস্ব-ব্যবস্থায় উন্নত প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। রাজপুতনার রাজন্যবর্গ যে স্ব স্ব রাজ্য রক্ষার জন্য মুসলমান বিজেতাদের সহিত যুদ্ধে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা কর্ণেল টড্ তৎপ্রণীত রাজস্থানের ইতিহাসে প্রশংসার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। হিন্দুরা ধর্ম্ম ও কৃষ্টি রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়াই আজ আমরা হিন্দু বলিয়া পরিচয় দান করি। মুসলমান-সাম্রাজ্য "tax-gathering empire" বলিয়া ইউরোপীয় লেখকেরা বর্ণনা করেন। হিন্দুদের জীবনধারা মুসলমান শাসনকালে অব্যাহতই ছিল। মুসলমান রাজন্যবর্গ মুলুকগিরি করিতেন এবং তদ্বিষয়ে মনোযোগীও ছিলেন। হিন্দুর শিল্প, কৃষ্টি, শিক্ষা, সমাজ-ব্যবস্থা প্রভৃতিতে রাজারা হস্তক্ষেপ করেন নাই। ধর্ম্মপ্রচারেও তেমন আগ্রহ বা উৎসাহ তাঁহাদের সকলের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই।

পরন্তু, চতুর্থ খলিফার পর হইতেই তাঁহাদের পক্ষে রাজ্যপ্রসার করার কার্য্যই প্রধান হইয়া ওঠে। ডামাস্কাশ্, বাগ্দাদ, স্পেন ও আফ্রিকার শাসনকর্ত্তারা রাজকার্য্যে নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন ও মুসলমান কৃষ্টির উন্নতি বিধান করিয়া মুসলমান ধর্ম্মকে গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন। ভারতের কৃষ্টি যদিও তাঁহাদের দ্বারা বিশেষ উপকৃত হয় নাই এবং ভারতীয় মুসলমানগণের মধ্যে মুসলমান কৃষ্টিরও তেমন উন্নতিলাভ হইয়াছে মনে হয় না, তথাপি তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এদেশীয় কৃষ্টির সমাদর করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সম্রাট্ আকবর ও রাজপুত্র দারা এই উদারতার জন্য খ্যাতিলাভ করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গের শাসনকর্ত্তা হুসেন শাহা ও পরাগল খানের নিকট বাংলা ভাষা বিশেষ ঋণী। এই সম্বন্ধে স্বর্গগত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাংলা ভাষার ইতিহাসে বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। মুসলমান শাসকগণের মধ্যে কেহ কেহ অন্ধবিশ্বাসের বশীভূত হইয়া বল-প্রয়োগে ধর্ম্মবিস্তার করিয়াছেন এবং তজ্জন্য কাশ্মীরে যথেষ্ট অত্যাচারও হইয়াছিল। তাই আজ কাশ্মীরের অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান। কাশ্মীরীয় পণ্ডিতগণ সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছেন। আমাদের তন্ত্রের কোনো কোনো প্রধান গ্রন্থ ঐদেশীয় পণ্ডিতগণের দ্বারা প্রণীত হইয়াছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে কাশ্মীরের স্থান উচ্চে। বল-প্রয়োগের ফলে অনেকে কাশ্মীর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। আওরঙ্গজেব বাদশাহের অনুদারতা-সম্বন্ধে এই মাত্র বলিতে চাই যে, তাঁহার অনুদারতাই মোগল-সাম্রাজ্য-ধ্বংসের একটী প্রধানতম কারণ হইয়া রহিয়াছে। হিন্দুগণের সহিত যাঁহারা আদান-প্রদান দ্বারা মৈত্রী করিয়াছিলেন, তাঁহাদের গৌরব ইতিহাসে কীর্ত্তিত।

বাবর হইতে আরম্ভ করিয়া যে দুইশত বৎসর কাল মোগল সাম্রাজ্যের স্থিতিকাল ধরা হয়, এই সময়ের মধ্যে ভারতে একটা একতা ও জাতীয়তার অভ্যুদয় হইয়াছিল। মোগল সম্রাট্ আকবর সমস্ত ভারতে একটা একতা গড়িয়াছিলেন এবং দীন ইলাহি নামক একেশ্বরবাদও প্রচার করিতেন। কিন্তু সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের জন্য যে শিক্ষা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে থাকা দরকার, তাহা ত ছিল না। কাজেই হিন্দু এবং মুসলমান কেহই এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন না। আকবর হিন্দুগণের সহিত যে সখ্যস্থাপন করেন, সেই সখ্য একেবারে নূতন ছিল না। মুসলমান রাজন্যবর্গ সর্ব্বত্রই ভিন্ন জাতীয় স্ত্রীদিগকে অন্তঃপুরে গ্রহণ করিতেন। ইহুদী, খৃষ্টান প্রভৃতি রমণীগণকে মুসলমানেরা বিবাহ করিতেন এবং তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসেরও সম্মান দিতেন। পরের ধর্ম্ম একেবারে মিথ্যা, এমন কথা হজরত মহম্মদও শিক্ষা দেন নাই। তিনি যিশু, এব্রাহম, মুশা প্রভৃতি পয়গম্বরগণের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করিয়াছেন। কেবল নিজের ধর্ম্ম ঐসকল ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এই কথা বলিতেন। মুসলমান শাসকগণের জ্ঞানের প্রতিও মনোযোগ ছিল, তাই তাঁহারা গ্রীক ভাষার গ্রন্থাদি আরবীতে অনুবাদ করাইয়া মুসলমান কৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। অধিকাংশ শাসনকর্ত্তাই হিন্দুগণের সহিত সন্ধি করিয়া শাসনকার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন। হিন্দুগণ স্ব স্ব জাতীয় ব্যবসায় পরিচালন করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। এখনকার মত পূর্ব্বে খাদ্যাভাব ছিল না। অস্ত্রবিহীন হইয়া তাঁহারা নিতান্ত "ঠুটো জগন্নাথ"ও সাজেন নাই; চোর-ডাকাতের হাত হইতে নিজেরাই ধনপ্রাণ রক্ষা করিতেন এবং আদালতের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া বিবাদ মীমাংসা করিতে পারিতেন। স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বলিতেন যে, মুসলমান রাজত্বকালে হিন্দুরা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন-ভাবেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। হিন্দু রাজাদের রাজত্বকালে যে ভাবে তাঁহাদের জীবন চলিত, তাহা অপেক্ষা বিশেষ কিছু পার্থক্য তখন ঘটে নাই। কেবল পণ্ডিতগণ সংস্কৃত সাহিত্য ইত্যাদির সেবার জন্য রাজানুকূল্য বিশেষ লাভ করেন নাই, ধনী হিন্দুগণের সাহায্যই তাঁহাদের পক্ষে প্রাপ্য ছিল। মুসলমান রাজন্যবর্গ এদেশীয় বিজ্ঞান বা শিল্পের উন্নতির জন্য কিছু করেন নাই সত্য, কিন্তু হিন্দু-কৃষ্টির পথে বাধাও দান করেন নাই এবং পণ্ডিতগণ সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা যথাসম্ভব বজায় রাখিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহারা ব্রহ্মোত্তর এবং দেবোত্তর সম্পত্তি ভোগ করিতেন। মুসলমান শাসনকর্ত্তারা এই বিষয়ে বাধা দেন নাই। সিন্ধুদেশ-বিজয়ী কাশিম ব্রাহ্মণ ও দেবতার অধিকার স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহার পরবর্ত্তী মুসলমান বিজেতারাও স্বীকার করিয়াছেন। যাঁহারা ষোড়শ শতাব্দী হইতে ইউরোপের নব জাগরণের ন্যায় এদেশে জাগরণ হয় নাই বলিয়া দুঃখ করেন, তাঁহারা মনে রাখিবেন যে, ইউরোপের ও এশিয়ার লোকের প্রকৃতি এক নহে; উভয় মহাদেশের ভৌগোলিক সংস্থানও এক নহে।

ইউরোপীয় সভ্যতাতে প্রাচীন গ্রীকগণের সময় হইতেই ঐহিক জীবন-সম্বন্ধে যে দৃষ্টি বর্ত্তমান দেখা যায়, এশিয়াতে সেই দৃষ্টির অভাব রহিয়াছে। ইউরোপে খৃষ্টান ধর্ম্মের যেরূপ অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া লোকেরা অব্যাহতির চেষ্টা করিয়াছে, মুসলমানগণের বা তাঁহাদের অধীন অন্যধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি সেইরূপ অত্যাচার হয় নাই। কাজেই সেইরূপ চেতনাও জাগে নাই। তা ছাড়া ইউরোপের অধিবাসিবৃন্দ অভাবের পীড়নেও দেশ-দেশান্তরে যাইতে বাধ্য হইয়া বিজ্ঞতালাভ করিয়াছেন। পূর্ব্বেই এই সব কথা কিছু বলা হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইউরোপীয় জীবনেও বিজ্ঞানের বিশেষ প্রয়োগ দেখা যায় না। তাঁহাদের শিল্পবাণিজ্যও এশিয়ার উৎপন্ন দ্রব্যের উপরই নির্ভর করিত। পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন-কার্য্যে এশিয়া এবং ভারতবর্ষেরই খ্যাতি ছিল। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এদেশে প্রাচীন কালেও

চিকিৎসাকার্য্য সম্পাদিত হইত। বিজ্ঞানের ইহাই ছিল প্রধান প্রয়োগ। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এদেশের চিকিৎসা-প্রণালী ইউরোপের প্রণালী অপেক্ষা পশ্চাৎপদ ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে ইউরোপ আমাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া দিয়াছে। তজ্জন্য হিন্দু বা মুসলমান রাজারা দায়ী, এরূপ মনে করা যায় না। ব্যক্তিবিশেষের জীবনে যেমন একটা দৈবশক্তির কার্য্য দেখা যায়, জাতীয় জীবনে বা একটা দেশের ভাগ্যেও দৈবশক্তির ক্রিয়া স্বীকার করিতে হয়। কোনো কোনো নূতন তত্ত্ব ইউরোপে আবিকৃত হইয়াছে, ইহার কারণ আমরা সম্যক্ বুঝিতে পারি না। তাঁহারা Nordic race বা অন্য superior race-ভুক্ত বলিতে পারেন, কিন্তু এদেশ-বাসীদের মানসিক বা উদ্ভাবনী শক্তি কিছু কম নহে, তথাপি এ শক্তির গতি অন্য দিকে। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় বহুকাল পূর্ব্বে তাঁহার ওজস্বিনী এক বক্তৃতায় এশিয়া ও ইউ-রোপের তুলনা করিয়া ইউরোপের শ্রেষ্ঠতা বিজ্ঞানে এই কথা স্বীকার করিয়া এশিয়ার নীতিধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিয়াছেন। ইউরোপের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব উদ্ভাবনে মৌলিকতা স্বীকার করিলেও এশিয়া যে ধর্ম্ম ও নীতির শিক্ষক তাহাতে সন্দেহ নাই। জাপানবাসীরা এশিয়ার বৈজ্ঞানিক বল প্রমাণ করিতেছেন এবং আমরাও যে মানুষ-মারার বিদ্যা আয়ত্ত করিতে পারিব, তাহা আশা করিতে পারি। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত যে সব যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে তাহাতে ভারতীয় সৈন্যের অশ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত হয় না। যদিও গ্রীক লেখকেরা Xenophon হইতে আরম্ভ করিয়া এশিয়াবাসিগণের অক্ষমতার বিবরণ দিতে কসুর করেন নাই, তথাপি সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, এদেশের লোকেরা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলে মানুষ-মারার কাজে হটিবার নহে। বর্ত্তমান যুদ্ধেও ভারতীয় সৈন্যেরাই সাম্রাজ্য রক্ষা করিতেছে। মারহাট্টা ও শিখগণ যে সকল যুদ্ধ করিয়াছেন, তাহা মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, যুদ্ধবিদ্যাও অন্য বিদ্যার ন্যায় শিখিতে পারা যায়। ইউরোপীয় লেখকগণ নিজেদের বীর্য্যের শ্রেষ্ঠতা-প্রদর্শনে ব্যস্ত হইয়া এশিয়ার প্রকৃত বিবরণ লিখিতে পারেন নাই।

মুসলমান রাজন্যবর্গ নানা সম্প্রদায়ে এবং জাতিতে বিভক্ত ছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দী হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত যাঁহারা উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে রাজশক্তি পরিচালিত করিলেন, তাঁহাদিগকে সাধারণ ভাবে পাঠান বা তুর্কি-জাতীয় বলা হয় এবং বাবরের বংশকে মোগল আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। কালক্রমে ইঁহারা হতবীর্য্য ও বিলাসপরায়ণ হইয়া পড়েন। ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ইউরোপীয় বণিকেরা এদেশে আসিতে আরম্ভ করেন। হিমালয় ও সমুদ্র এতদিন ভারতকে রক্ষা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সমুদ্রের দিকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা কি হিন্দু, কি মুসলমান কেহই করেন নাই। কেবল চন্দ্রগুপ্তের সৈন্যদের মধ্যে একটা নৌবিভাগ ছিল এবং শিবাজী মহারাজেরও নৌবিভাগ ছিল, কিন্তু অন্য কেহ সমুদ্রের দিকে যে শত্রুর আক্রমণ হইতে পারে তাহা ভাবিতেও পারেন নাই। এই জন্য আকবরের ন্যায় ক্ষমতাশীল রাজা পর্ত্তুগীজদিগের নিকট নতি স্বীকার করিতে বাধ্য হন। হিন্দু ও মুসলমান রাজগণ আত্মরক্ষা-বিষয়ে বাস্তবিক বিশেষ সাবধান ছিলেন না। চীনদেশের রাজা যে ভাবে প্রকাণ্ড প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া দেশ-রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এদেশের শাসনকর্ত্তারা সেই ভাবের দূরদর্শিতার পরিচয় কিছুই দেন নাই। চীনে একটা একচ্ছত্র রাজত্ব কুব্‌লাখানএর সময় হইতেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার কথাও হিন্দু কি মুসলমান রাজারা ভাবিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। সাজাহান বাদশার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া কান্দাহার-জয়ের জন্য যে অর্থব্যয় হইয়াছিল, তাহা দ্বারা বোধ হয় ভারতের সীমান্তে প্রকাণ্ড প্রাচীর নির্ম্মাণ করা যাইতে পারিত। সমগ্র ভারতের রক্ষার কথা কাহারও মনে জাগিয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। আজও ত ভারত সেই উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আরণ্য-জাতীয় লোকদিগের

দ্বারা উপদ্রুত হইতেছে। আতিথেয়তা দ্বারা পরিচালিত হইয়া বিদেশী বণিক্‌দিগকে রাজারা জায়গীর এবং পাট্টা দিয়া, খাল কাটিয়া কুমীর আনয়ন করিয়াছেন। হিন্দু মুসলমান উভয়েই বিদেশীয়গণকে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং নানাস্থানে ফ্যাক্টরী নির্ম্মাণের অধিকার দিলেন। কলিকাতা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ প্রভৃতি সহরে বণিক্‌রা নিজের আইন-কানুন মানিতে লাগিলেন, নিজেদের বিচারালয় ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিলেন এবং সিপাহী নিযুক্ত করিয়া স্বাধীনভাবে চলিতে লাগিলেন, যাহাকে lawতে Imperium in imperio বলে; অর্থাৎ রাজ্যের ভিতরে ছোট ছোট রাজ্য বণিক্‌রা গড়িয়া তুলিলেন এবং সিরাজউদ্দৌলা প্রভৃতির সহিত লড়াই করিয়া তাঁহাদের রাজত্ব নষ্ট করিয়া দিলেন। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের ইহাই প্রধান কারণ। ইউরোপীয় বণিক্‌রা মোগলের পতন না ঘটাইলে, আজও হয়ত মোগল-রাজত্ব বা মারহাট্টা-রাজত্ব চলিতে পারিত।

রাজনীতির জ্ঞান বাস্তবিক এদেশে তেমন ছিল না। এদেশের হিন্দুরা ত খুবই সরল এবং উদার ছিলেন। যদিও কৌটিল্যের অর্থনীতি প্রভৃতি শাস্ত্রে কূট রাজনীতি-সম্বন্ধে উপদেশ রহিয়াছে, তথাপি Machiavelliর Princeএ যে ভাবের দুর্নীতিমূলক ব্যবস্থার কথা লিখিত আছে, তাহা এখানকার শাস্ত্রকারগণের বুদ্ধির অতীত। ইহারা সন্দেহের চক্ষে কাহাকেও দেখেন নাই। মুসলমানেরাও যে কূট রাজনীতি বিশেষ জানিতেন, তাহা মনে হয় না। হজরত মহম্মদের সময় হইতেই তাঁহারা একটা উদার নীতি অবলম্বন করিয়া ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকদিগকে নিজ নিজ আইন-কানুন মানিয়া চলার অধিকার দিতেন। *

পক্ষান্তরে তাঁহাদের নিজেদের মধ্যেও আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর নানারূপ গৃহবিবাদ উপস্থিত হইল এবং তেমন ক্ষমতাপন্ন লোক কেহ না থাকায় আছফ খাঁ বা চিনকিলিছ খাঁ নিজাম-রাজ্য স্থাপন করিয়া স্বাধীন হইলেন, সাদত আলী অযোধ্যায় পৃথক্ রাজ্য গড়িলেন; এই ভাবে আরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলমান রাজ্য স্থাপিত হওয়াতে মোগল-সাম্রাজ্য শীর্ণকায় হইল এবং মুসলমান শক্তি দুর্ব্বল হইয়া আত্মরক্ষায় অপারগ হইল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে হিন্দুগণ আত্মরক্ষা করিয়াই আমাদের সভ্যতা বাঁচাইয়াছেন। বিজয়-নগর-সম্বন্ধে একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কয়েকজন ভ্রাতা বিজয়নগর নামক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া দক্ষিণ ভারতে হিন্দু সভ্যতা রক্ষার উপায় করেন। তাঁহাদের সাম্রাজ্যের ইতিহাস Sewel "The Forgotten Empire of Bijoynagar" নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই রাজ্যের সমৃদ্ধি মোগল-সাম্রাজ্যের অনুরূপই ছিল এবং এই রাজ্যের সামরিক শক্তিও অজেয় ছিল। দক্ষিণ ভারতের পাঁচটী মুসলমান শক্তি আদিল শাহী, বিরিদ শাহী, ইমাদ শাহী ইত্যাদি মিলিত হইয়া এক যোগে ইহার ধ্বংস বিধান করেন। এই রাজ্যটী খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয় এবং তেলিকোটার যুদ্ধে ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে মুসলমানগণ-কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়। মুসলমানগণ একযোগে ইহাকে ধ্বংস করেন, কিন্তু কোনো হিন্দু রাজা ইহাকে সাহায্য করিলেন না। সুলতান মামুদের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত হিন্দুদের মধ্যে এইরূপ মনোভাবই দেখা যাইতেছে। আমার পিতামহী বলিতেন "এক ভাইকে কোনো অপজাতি কিলায়, আর ভাই ডুব দিয়া সরিয়া যায়"। আমাদের পরস্পরের

---

* ইউরোপীয় টার্কিতে সুলতানগণ বহু খৃষ্টান সম্প্রদায়কে নিজ নিজ আইন-কানুন মানিতে দিয়াছিলেন, তজ্জন্য কামাল পাশাকে জাতি-গঠনে বেশ বেগ পাইতে হয় এবং তিনি সেই সকল খৃষ্টান সম্প্রদায়কে এক আইনের অধীনতা স্বীকারে বাধ্য করিয়া জাতিগঠন-কার্য্য সম্পন্ন করেন। উত্তরাধিকার বা ধর্ম্ম-সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়কে নিজ নিজ আইন মানিতে দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু আধুনিক শিক্ষা, শিল্প, কি দণ্ডবিধি-সম্বন্ধে এক নিয়মাধীন হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

সহিত সহানুভূতির অভাব চিরকাল বিদ্যমান দেখা যাইতেছে। ইহা যে জাতিভেদের একটী ফল, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

১৫৬৫ খৃষ্টাব্দের পর বিজয়নগরের রাজাদের পক্ষে হিন্দুকে রক্ষা করা আর সম্ভব হইল না। শিবাজী জন্মিলেন সপ্তদশ শতাব্দীতে (১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে), তিনি পুনরায় হিন্দুর রক্ষা-কার্য্যে ব্রতী হইয়া একটী হিন্দু-রাজত্ব গড়িয়া তুলিলেন এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্র-শক্তি পরাক্রান্ত হইয়া উঠিল। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর এই মহারাষ্ট্র-শক্তিই ভারতের কেন, মোগল সম্রাটেরও রক্ষক হইলেন। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারত-ইতিহাস আমাদের বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করা কর্ত্তব্য। অষ্টাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ-ভারতে মহারাষ্ট্র-জাগরণ এবং উত্তর-ভারতে শিখশক্তি-গঠন, এই দুইটীই হিন্দুর জাগরণ প্রমাণিত করে। একেশ্বর-বাদী মুসলমান ধর্ম্মের সংঘাতে যে কয়েকটী নূতন সম্প্রদায় গড়িয়া উঠে, তন্মধ্যে গুরুনানকের সম্প্রদায়ই আজও প্রবল। শ্রীচৈতন্যদেবের সম্প্রদায় বাঙ্গালাদেশে নূতন পৃথক্ সম্প্রদায় গড়িতে পারিলেন না ; ব্রাহ্মণ গোস্বামিগণ জাতিভেদের ভেদনীতি বজায় রাখিয়া পৃথক্ সম্প্রদায় খাড়া হইতে দিলেন না, ইহারা ভাবের বন্যায় ভাসিয়া যাইয়া দেশে যে শক্তি জাগরিত হইতে পারিত তাহা ঘটিতে দেন নাই। কবীর, দাদু প্রভৃতির একেশ্বর-বাদও সমাজ গড়িতে পারে নাই। গুরুগোবিন্দ সিংএর ব্যবস্থাতেই যুদ্ধনিপুণ শিখেরা একটী সম্প্রদায় গড়িয়া উত্তর-ভারতে হিন্দুর পুনরভ্যুদয় ঘটাইয়াছিলেন। হিন্দুগণ মুসলমান একেশ্বর-বাদের আক্রমণ প্রতিহত করিলেন বটে, কিন্তু সামাজিক পরিবর্ত্তন কেবল গুরুগোবিন্দ সিংই ঘটাইতে পারিলেন। শিবাজী মহারাজের শাসন-বিধানে শাস্ত্রের নিগড় মানা হইল, তাহাতেই ক্রমে জাতিভেদের বিচ্ছিন্ন-ভাব এই শক্তিকেও প্রতিহত করিতে লাগিল। স্যার যদুনাথ সরকার মহাশয়ের "শিবাজী" গ্রন্থখানা পাঠ করিয়া মহারাষ্ট্র-শক্তি নষ্ট হইবার কারণ সকলের অবধারণ করা কর্ত্তব্য। অষ্টাদশ কেন ঊনবিংশ শতাব্দীতেও যদি হিন্দুশক্তি, যথা, মহারাষ্ট্র, রাজপুত ও শিখগণ এক যোগে কাজ করিতে পারিতেন, ও সমগ্র ভারতের কথা ভাবিতে পারিতেন, তাহা হইলে ভারত পরাধীন থাকিত না। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মহারাষ্ট্র-শক্তি প্রবল আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিল সত্য, তথাপি যদি মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে ভেদ ও বিবাদের সৃষ্টি না হইত, অন্ততঃ নানাফার্ণাবিশ যদি আরো কিছু দিন বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে হয়ত ভারত পরাধীন হইত না। ভারতের ভাগ্য-নির্ণয় হইয়া গেল ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে এশাই-এর যুদ্ধে। দুঃখের বিষয় ভারতে যে হিন্দুদের শক্তি জাগিতেছে, একথা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় না ; মুসলমান-আক্রমণে হিন্দুগণ কিছুকাল অসাড়ের মত ছিলেন সত্য, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতেই জাগরণ আরম্ভ হয়। বিজয়নগর গেল, কিন্তু মহারাষ্ট্র-শক্তি জাগিল দক্ষিণে এবং শিখশক্তি উত্তরে। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে তাঁহাদের ক্ষতি সত্ত্বেও মহারাষ্ট্রীয়গণ এত শক্তিলাভ করিলেন যে অষ্টাদশ শতাব্দীকে মহারাষ্ট্র-শতাব্দী বলা যায়। একখানা বই লিখিয়া হিন্দুর জাগরণটী পরিষ্কারভাবে দেখান দরকার। হিন্দু এবং মুসলমান উভয়ে নবশিক্ষা, নব-দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ভারতকে modernise করিয়া মুক্ত করিবেন—মুসলমান ভ্রাতারা যে কেন এই সোজা কথাটা না বুঝিয়া কয়েকটা চাকুরীর জন্য ব্যস্ত হইয়া ভেদের কথাটাকে বড় করিয়া তুলিতেছেন, তাহা ত বুঝি না। ভারত যদি পরাধীনতা হইতে মুক্ত হয়, তাহাতে মুসলমানের ত ক্ষতির সম্ভাবনা নাই ; হিন্দুদের অসীমধৈর্য্য ও সহনশীলতা রহিয়াছে, মুসলমান ধর্ম্মকে ত হিন্দুরা হেয় মনে করেন নাই, বরং ইহা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া জাতিভেদের তীব্রতা-হ্রাসের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। কি মুসলমান, কি হিন্দু কেহই ইতিহাস পাঠ করিতে যেন রাজী নহেন। ভারতের ইতিহাস উভয়েরই গৌরব কীর্ত্তন করে এবং ভারতের সভ্যতাতে

উভয়ের অবদান গ্রহণ করিতে হইবে, এবং নবশিক্ষা গ্রহণ করিয়াই জাতি বা Nation গড়িতে হইবে। ভারতের নবজাগরণ হিন্দুরা গ্রহণ করিয়াছেন, মুসলমানদিগকেও তাহা গ্রহণ করিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। ভারতের শিল্পবাণিজ্য সব বিষয়েই উভয়ের একযোগে চলিতে হইবে।

আমি পূর্ব্ব প্রবন্ধে ক্ষাত্রশক্তি ও ব্রাহ্মণ্যশক্তির একযোগে নব্যভারতে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার কথার একটু উল্লেখ করিয়াছি, শেষ প্রবন্ধে বিশেষ ভাবে কথাটা পরিষ্কার করিব, এবং কেবল উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে নব শিক্ষা দ্বারা ইতিহাসের ধারা কি ভাবে পরিবর্ত্তিত হইতেছে এই বিষয়ে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিব মাত্র। ইতিহাসে বাস্তবিক পক্ষে আকস্মিক ঘটনা কিছু নাই। বিশ্বপ্রকৃতিতে যে ভাবে নিয়মানুবর্ত্তিতা দেখা যায় এবং দৈবশক্তিরও ক্রিয়া অস্বীকার করা যায় না, মানব ইতিহাসেও সেইরূপ কতকগুলি নিয়ম এবং দৈবশক্তির ক্রিয়া বর্ত্তমান আছে। বিজয়নগর চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া হিন্দুর রক্ষা-বিধান কতকটা করিয়া দিল, কিন্তু এই ক্ষাত্রশক্তি মহারাষ্ট্র-ক্ষাত্রশক্তির ন্যায়ই হিন্দুর একতা বিধান করিতে পারিল না। বিজয়নগরের সাম্রাজ্য ও মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্য একই কারণে হিন্দু সমাজের গঠনের ধরণ বদলাইতে পারে নাই, যদিও মহারাষ্ট্রে একটা জাতীয়তার ভাব ক্রমশঃ ফুটিতেছিল। শিখজাগরণ সমাজ-গঠনকে বদলাইয়া একটা একতা বিধান করিয়া সবল হইয়াছে। কবীর, দাদু, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি সাধকগণের মধ্যে শুধু ব্রাহ্মণ্য-শক্তির ক্রিয়া দেখা যায়, তাঁহারা ক্ষাত্রশক্তির সাধনা-ব্যতিরেকে যে সমাজ গড়া যায় না এবং ধর্ম্মমতকে আকার দিয়া সুস্থ ও সবল করা যায় না—সেই সব বিষয়ে মনোযোগ দেন নাই। উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় শিক্ষা দ্বারা নব দৃষ্টিলাভ হওয়াতে জাতীয়তা বা Nation-গঠনে চেষ্টা দেখা যায়। এই দৃষ্টি প্রথম রামমোহন রায়েতে দেখা যায়। তৎপর স্বামী দয়ানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি নেতারা হিন্দু সমাজকে একতা দ্বারা সবল করার চেষ্টা করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষার শ্রেষ্ঠতা এই স্থানে। এই শিক্ষাতে নব জাগরণ, নব চেতনা আসিয়াছে, তাই এই শিক্ষালাভ করিয়া আমরা হিন্দু সমাজকে নবভাবে গঠন করিতে প্রয়াসী, কিন্তু এই প্রয়াস ব্যাহত হইতেছে। প্রাচীন ভাবের ব্রাহ্মণ্য-শক্তি সামাজিক পরিবর্ত্তনের বিরোধী। ইহাতে বিজয়নগরের আত্মরক্ষার ন্যায় আমাদের আত্মরক্ষার চেষ্টা কার্য্যকরী হইতেছে না, মহারাষ্ট্র-শক্তিও তজ্জন্যই দাঁড়াইতে পারে নাই। Social Reconstruction সাধিত না হইলে সমাজের অসাড় ভাব দূর হইবে না। বৈদিক সময় হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সমাজ ও শাসন-কার্য্য এক আদর্শে চলিয়াছিল, কিন্তু তাহার পর হইতেই এই যোগ বর্ত্তমান নাই। সমাজ ও শাসন পৃথক্ আদর্শের অনুসরণ করিতেছে। আমরা টানিতেছি শরীরটাকে, কিন্তু সমাজের মন এবং আত্মাটা পড়িয়া আছে জাতিভেদ ইত্যাদির নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া। জাতিভেদের উপকারিতা প্রাচীন সময়ে ছিল, আজও আছে, ভবিষ্যতেও থাকিবে। আমি চতুর্থ প্রবন্ধে এই সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিব। এখন এই মাত্র বলিতে চাই যে আমরা দোটানায় পড়িয়া উনবিংশ শতাব্দী হইতেই ঘোরপাক খাইতেছি; বিংশ শতাব্দীতে মাত্র আমি একটু আলোক দেখিতেছি, এই আলোকটা হিন্দু-মহাসভা প্রজ্বালিত করিয়াছেন; কিন্তু যেন সাহস পাইতেছে না। ইহাতে সমস্ত হিন্দু-সমাজকে জাগাবার চেষ্টা সুরু হইয়াছে বটে, কিন্তু মনে হয় যেন নেতারা পরিষ্কারভাবে আদর্শ গড়িতে পারিতেছেন না। আমার মতে বৈদিক-কালে যে ভাবে আত্মিক শুদ্ধতার দিকে মন ছিল, সেই ভাবে আত্মিক শুদ্ধতার জন্য আচারানুষ্ঠান অবলম্বন করিতে হইবে এবং আত্মিক পূজার প্রাধান্য স্বীকার করিয়া সকলের পক্ষে অনুষ্ঠেয় একটা পূজাপদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে।

তখন যদি গায়ত্রী মন্ত্র দ্বারা সকলে আধ্যাত্মিক চিন্তা করিতে পারিত, এখনও তাহা করিতে পারিবে। এখন ত সকলেই এক শিক্ষা গ্রহণ করিতেছেন এবং এই ভাবে একটা নব ব্রাহ্মণ্য-শক্তি জাগিতেছে। হিন্দুসভা হিন্দুধর্ম্মের যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা খুব সমীচীন এবং যৌক্তিক সংজ্ঞা হইয়াছে। আধ্যাত্মিক পূজা সকল সম্প্রদায়েরই স্বীকার্য্য রীতি। এই রীতিটা জাতীয় সভাসমিতিতে অনুষ্ঠিত হইলে ভাল হয়। আমি বিজয়নগরের ও মহারাষ্ট্র-শক্তির সাম্রাজ্য-ধ্বংসের কারণ ব্রাহ্মণ্য-শক্তির নিষ্ক্রিয়তা বলিয়া মনে করি। আজকাল সকল দেশেই মানুষমাত্রকেই সবল করার চেষ্টা হইতেছে। আমরা প্রাচীন মত অনুসারে সকলকে সবল করিতে চেষ্টা করিতেছি না, কেবল উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা হিন্দু সভ্যতার মূল সত্য জানিতেছেন ও তদ্দ্বারা জ্ঞানী ও গুণী হইয়া সবল হইতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অল্প, সমাজ-দেহের অধিকাংশ অজ্ঞান-মোহে অসাড়; তাহারা বর্ত্তমান জাগরণের কথা শুনেও নাই। কাজেই সমস্ত সমাজ বাতব্যাধিগ্রস্তের ন্যায় পঙ্গু মনে হয়। হিন্দুসভা যদি একটা পূর্ণাঙ্গ সামাজিক আদর্শ গ্রহণ করিয়া হিন্দুর ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল-বিধানের জন্য ব্রতী হয়েন, তাহা হইলে আমার মনে হয় কালক্রমে শক্তিলাভ হইবে এবং সমস্ত সমাজ-দেহে নূতন জীবন সঞ্চারিত হইবে। প্রাচীনকে নব সাধনার সঙ্গে সমন্বিত করিতে হইবে। রজোগুণের ক্রিয়াকে সত্ত্বগুণের সহিত মিলিত করিতে হইবে। আমরা নব শিক্ষিতেরা রজোগুণের সেবা করিতেছি, কিন্তু সকলকেই সত্ত্বগুণের সহিত অন্বিত হইতে হইবে। বেদে যে ভাবে সমস্ত সমাজকে এক দেহরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং সমাজ-রক্ষার্থ ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তিবিভাগ বিধান করিয়া একতার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে, বিংশ শতাব্দীতে সেই আদর্শকে পুনরায় নূতন আকার দান করিতে হইবে। ইতিহাসের ধারা-বিষয়ে চিন্তা দ্বারা আমি এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছি। জাতিভেদ ইত্যাদি বিষয়ে পরে আরও বলিব এবং পঞ্চম প্রবন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য বিষয়ে আলোচনা করিব, এখানে শুধু হিন্দুর সুপ্তশক্তির সম্বন্ধে কথা বলাই আমার উদ্দেশ্য। হিন্দুর আত্মরক্ষার জন্য অতীতে কি ভাবে আত্মরক্ষা করা হইয়াছে তাহা বলিবার চেষ্টা করিলাম।

---

(৩) আধ্যাত্মিক তত্ত্ব

হিন্দু সভ্যতার মূল কথা ইহার আধ্যাত্মিক তত্ত্ব। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষালাভ করিয়া আমরা এই তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করি না এবং বুঝিবার শক্তিও হারাইয়া ফেলিতেছি। য়ুনিভারসিটীতে দার্শনিকতত্ত্বের বিচার ও আলোচনা হইতেছে সত্য, কিন্তু জীবনে ধর্ম্মের আচরণ না থাকাতে দার্শনিক বিচার নিষ্ফল হইয়া যাইতেছে। "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্" অর্থাৎ আস্তিক্য-বুদ্ধি-দ্বারা জ্ঞানলাভ হয়, আজ একথাটাও আমাদের আলোচনাতে স্থান পায় না। এদেশে দর্শনের জ্ঞান সাধকগণের সাধনমার্গে অবলম্বিত হইত এবং তদ্দ্বারা সাধকগণ সত্যলাভ করিতে চেষ্টা করিতেন। "শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন"—অর্থাৎ আচার্য্যের নিকট হইতে তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে হইত এবং তৎপর গভীর

ভাবে ধ্যান করিয়া সেই সত্যকে প্রাণে লাভ করার চেষ্টা হইত। কেবল বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা দ্বারা পূর্ণ সত্যের উপলব্ধি হইতে পারে না, সত্যলাভে ভগবৎ-কৃপার উপরও নির্ভর রাখা আবশ্যক। আমাদের চোখ দেখিলে আমরা যে সত্যলাভের জন্য ব্যাকুল এবং মননশীল তাহা মনে হয় না, আমাদের অধিকাংশ লোকের পাণ্ডিত্য তোতাপাখীর ন্যায় অপরের লিখিত কথার পুনরুল্লেখ মাত্র। আমরা নিজের মনীষাতে সত্য লাভ করিয়া কথা বলি না। আমরা পাণ্ডিত্যাভিমানী এবং পাণ্ডিত্যেরই গৌরব করি ও পাণ্ডিত্যেরই প্রশংসা করি। পরন্ত ঋষি বলিয়াছেন "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ" অর্থাৎ পাণ্ডিত্যের দ্বারা আত্মাকে জানা যায় না, "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া" অর্থাৎ তর্ক দ্বারাও বিশ্বাস লাভ করা যায় না, "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" অর্থাৎ যাঁহাকে তিনি বরণ করেন বা কৃপা করেন, তাঁহার দ্বারাই তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হয়। সত্য লাভ করা সাধনা ব্যতিরেকে সম্ভবপর নয় এবং প্রকৃত সত্য কি তাহা বুঝাও অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। তাই গীতা বলিয়াছেন :

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥

[হাজার লোকের মধ্যে একজন হয়ত যত্নপূর্ব্বক সাধন করেন ধর্ম্মলাভের জন্য ; যাঁহারা সিদ্ধিলাভ করেন, তাঁহাদের সহস্রের মধ্যে এক জন হয়ত ধর্ম্মের তত্ত্ব ঠিকভাবে বুঝেন] সত্য ঠিক ভাবে বুঝা অত্যন্ত কঠিন। আমার স্বর্গীয় পিতামহ বলিতেন : "ধাম্মিক বিচারিয়া যাই, কোটীর মধ্যে গুটী (একটী) পাই।" বৈজ্ঞানিক সত্য, বা দেশে কালে আবদ্ধ সত্য, অঙ্ক-শাস্ত্রের সাহায্যে যে সত্যের পরিমাণ করা হয়, লেবরেটরিতে যাহার তত্ত্ব প্রত্যক্ষীভূত করা হয়, যে সব সত্যের জ্ঞান পশুপক্ষীতে কতকটা দেখা যায়, সেই সত্য-লাভ কিছু কিছু মানুষমাত্রেই করিতে বাধ্য এবং না করিতে পারিলে জীবন চলে না। ধর্ম্মের তত্ত্বও এই ভাবে কতকটা আমরা বুঝিতে পারি এবং পারি বলিয়াই বক্তৃতা দিতে প্রবৃত্ত হই বা গ্রন্থাদি লিখিয়া পরস্পরকে তত্ত্ব বুঝাইতে প্রয়াস পাই। কিন্তু ধর্ম্মের তত্ত্ব ঠিকভাবে বুঝিতে হইলে শ্রীনারদ ঋষি যে সনৎকুমারকে বলিয়াছিলেন, "আমি কেবল মন্ত্রবিৎ, আত্মবিৎ নহি", অর্থাৎ তিনি শাস্ত্র স্মৃতি-শক্তির সাহায্যে অন্তরে ধারণ করিয়াছেন, কিন্তু আত্মাতে সত্য দেখেন নাই, সেই কথাটী স্মরণে রাখিয়া সত্যান্বেষণে শ্রদ্ধালুচিত্তে নিযুক্ত হইতে হইবে।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের ন্যায় তাঁহাদের মন্ত্র-শিষ্য আমরা অনেকে ভারতীয় ধর্ম্মের উৎপত্তি, বিকাশ ও পরিণতি অন্যান্য দেশের ও জাতির ধর্ম্ম-বিধানসমূহ অপেক্ষা যে একটু অন্য রকমের এবং আমাদের জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি-সাধনা যে অন্য ধর্ম্মমতের অনুমোদিত সাধনার ন্যায় নহে, এই কথাটা বিশেষভাবে চিন্তা করি না। তাই বাহিরের আকারপ্রকার লইয়া তর্ক ও বিচার করি এবং যেহেতু ইউরোপীয়েরা জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিল্পকার্য্যে উন্নতিলাভ করিয়া আমাদের অপেক্ষা সুস্থ ও সবল বা আমাদের উপর প্রভুত্বলাভ করিয়া অহঙ্কৃত হইতেছেন দেখি, তখন ধরিয়া লই যে তাঁহাদের আদর্শই শ্রেষ্ঠ এবং তাঁহারা যে নীতির অনুসরণ করেন বা যে ভাবে সংসারের কাজ-কর্ম্ম করেন, তাহাই অবলম্বনীয়। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও বলেন যে, "আমাদের যে ধ্যান-ধারণা বা সমাধি-লাভের কথা শাস্ত্রে লিখিত আছে, এইগুলি দ্বারা আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি এবং যাঁহারা আত্মানাত্ম-বিচার করিয়া অনাত্ম জগৎ পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মোপলব্ধির জন্য পাগল তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত ; আমাদের অনেক সাধুসন্ন্যাসী সংসারের কাজকর্ম্ম অবহেলা করিয়া সন্ন্যাস-গ্রহণপূর্ব্বক যে জপে-তপে দিনরাত্রি অতিবাহিত করেন,

এবং অনাহারে অনিদ্রায় দিনরজনী যাপন করেন, ইহাতে তাঁহারা walking ghosts * বই আর কিছুই নন এবং এইরূপ আদর্শের সেবা করিয়া আমরা অধঃপাতে যাইতেছি।" ত্যাগের আদর্শকে এইভাবে অনেকে হীন মনে করেন, কেননা ইউরোপীয় লেখকেরা ইহা অপেক্ষা যিশুর শিষ্যগণের লোকশ্রেয়ঃ-সাধনকেই উচ্চতর আদর্শ মনে করেন। পক্ষান্তরে আমার বিশ্বাস যে এইরূপ "walking ghosts"রা এদেশে এখনও আছেন বলিয়া প্রকৃত ঈশ্বরতত্ত্বের জ্ঞান আমরা পাইতেছি এবং এদেশে এইরূপ কঠোর ত্যাগ কেহ কেহ অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়াই "অমৃতত্ব" লাভ করিয়া তাঁহারা প্রথ-প্রদর্শনে সমর্থ হইয়াছেন। "ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বম্ আনশুঃ"—ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হয়। আমি বিশ্বাস করি কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পিতা ত্যাগমন্ত্র-গ্রহণ-পূর্ব্বক "ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মজ্ঞান" সাধন করিয়াছিলেন বলিয়াই, তাঁহার পুত্রেতে সত্য প্রকাশিত হইয়া জগৎকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছে। রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয়ও সর্ব্বত্যাগের সাধনা করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার শিষ্যগণ ত্যাগকে বরণ করিয়া দেশের কার্য্যে ব্রতী রহিয়াছেন। এদেশের ত্যাগী সন্ন্যাসীরা যেসব তত্ত্ব আয়ত্ত করিয়া এই ধর্ম্ম গড়িয়া দিয়াছেন, তাহার জোরেই ভারতীয় সভ্যতা সহস্র রকমের অত্যাচার অতিক্রম করিয়া এখনও দণ্ডায়মান আছে এবং আমাদিগকে অভয়বাণী শুনাইতেছে।

ইউরোপীয় লেখকগণ ধর্ম্মের উৎপত্তি বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আফ্রিকা, আমেরিকা বা আমাদের দেশে যে সকল আরণ্যজাতীয় লোক আছে, তাহাদের রীতি-নীতি ও ধর্ম্মচর্য্যা-সম্বন্ধে বিবিধ তথ্যপূর্ণ গ্রন্থাদি লিখিতেছেন। তাহাদের মধ্যে কি ভাবে Animism, totemism, Magic প্রভৃতি নামক বিশ্বাস কার্য্য করিতেছে, তাঁহারা তাহার সূক্ষ্মতত্ত্ব আলোচনা করিতেছেন, যদিও এই ধর্ম্মবিশ্বাসে তাঁহারা কোন প্রকার Revelation বা ঈশ্বরের প্রকাশ দেখেন না। কেহ কেহ সুসভ্য গ্রীক, রোমকদের বা হিন্দুদিগের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের তুলনা করিয়া দেবতত্ত্বের আলোচনা করেন। মিশরীয়, আসীরীয় বা বাবিলনীয় ধর্ম্ম-বিশ্বাস কি প্রকার ছিল, সেই সব সভ্যজাতীয় লোকেরা পরকালে বিশ্বাসী ছিলেন কি না, ইত্যাদি রূপ তুলনামূলক আলোচনাও আজ কাল হইতেছে। কিন্তু এই প্রকারের আলোচনা পাঠ করিয়া মনে করিতে পারা যায় না যে, তাঁহারা মানবচিত্তে ধর্ম্মভাবের উৎপত্তি-সম্বন্ধে কোন স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। অনেকেই ভারতীয় ধর্ম্ম-সম্বন্ধে আলোচনা করেন সত্য, কিন্তু বেদাদি শাস্ত্র যে কখনও অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহা মনে হয় না। অধ্যয়ন করিলেও শ্রদ্ধার সহিত সত্য বুঝিতে বা সত্য-বিচারে চেষ্টা তাঁহারা বিশেষ করেন না। আমাদের পরাধীনতা ও এশিয়াতে বাসস্থান এই অপরাধদ্বয় তাঁহাদের অনেকের দৃষ্টিতে আবরণ সৃষ্টি করিয়া দেয়। এদেশে যে Animism, totemism, Magic ইত্যাদির স্তর ভেদ করিয়া ধর্ম্ম গড়ে নাই, পরন্তু আদিতেই একটা অলৌকিক দৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছিল, তাই বেদকর্ত্তা ঋষিগণ "অনামী" ঈশ্বরের জ্ঞান ও

---

* But to dwell in the realm of spirit does not mean that we should be indifferent to the realities of the world. It is a common temptation, to which Indian thinkers have fallen more than once victims, that spirit is all that counts, while life is an indifferent illusion, and all efforts directed to the improvement of man's outer life and society are folly. "Frequently the ideal of the cold wise man who refuses all activity in the world is exalted, with the result that India has become the scene of a culture of dead men walking the earth which is peopled with ghosts."

No one who holds himself aloof from the activities of the world and who is insensitive to its woes can be really wise. To practise virtue in a vacuum is impossible. Sir S. Radhakrishnan.

সত্তা উপলব্ধি করিয়া ঋগ্বেদের সূক্ত-রচনা-কালেই বিস্ময় প্রকাশ করিলেন "কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম," "কোন্ দেবতাকে হবিদ্বারা পূজা করিব"—এই যে দৃষ্টি তাঁহাদের আত্মাতে লাভ হইয়াছিল, সেই আত্মিক দৃষ্টি আজও খুলিবার জন্য আমাদিগকে তাঁহারা আহ্বান করিতেছেন। সেই অনামী দেবতাকেই তাঁহারা "ধর্ম্মাবহঃ পাপনুদঃ" (ধর্ম্মের নির্ব্বাহক এবং পাপনাশকারী) নাম দিয়াছেন। এই ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছিল ঋষিগণের আত্মাতে, তাই আজও এই ধর্ম্মের সাধনা আত্মিক পূজা। যে সব ধর্ম্ম উৎপীড়িত, দুর্দ্দশাগ্রস্ত দাসজাতি বা অবনমিত অত্যাচারিত নরনারীর ক্লেশের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বা মরুভূমির নির্জনতাতে যাহার সত্তা মানবচিত্তে জাগরিত হইয়াছে, তাহাদের নীতি-বিষয়ে ও লোকশ্রেয়ঃসাধনে যত্ন দেখিয়া হিন্দুধর্ম্মের আত্মিক * সাধনায় আগ্রহ বুঝা একটু কঠিন।

মোজেস যখন দাসত্ব দ্বারা উৎপীড়িত ইহুদীদিগকে মিশরের রাজার কঠোর অত্যাচার হইতে মুক্ত করিয়া স্বদেশ প্যালেষ্টাইনের দিকে লইয়া আসিলেন, তিনি তাহাদিগকে সবল করার জন্য নীতিশিক্ষার অত্যন্ত প্রয়োজন বুঝিতে পারিলেন। বালকগণকে যে ভাবে অলঙ্ঘনীয় নীতির শাসনে রাখিয়া বাধ্যতা শিক্ষা দিতে হয় ও নীতির শাসন দ্বারা মানুষ করিয়া তুলিতে হয়, ইহুদীগণকেও সেই ভাবে অলঙ্ঘনীয় নীতির দ্বারা দৃঢ়তা শিক্ষা দিবার জন্য ঈশ্বরের স্বয়ংদত্ত দশটী আদেশ পালনের ব্যবস্থা হইল। এই নীতিতে নীতিশিক্ষার মূল যে স্বাধীনতা তাহা স্বীকৃত হয় নাই। "Thou shalt not steal" এই নীতি অবশ্য পালনীয়, ইহাতে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করা হয় নাই। আজকালকার আইনে এই ভাবের নীতি শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এইরূপ ধর্ম্মকে Religion of legality বলা হয়। কাজেই বলিতে চাই যে ইহুদী ধর্ম্ম, খৃষ্টান ধর্ম্ম বা অন্য যে কোন নীতিমূলক ধর্ম্মের গৌরব করা হয়, তাহা বর্ত্তমান সময়ে গবর্নমেণ্টের আইন দ্বারা কতকটা বাতিল হইয়া যাইতেছে। নীতি স্কুলমাষ্টার ও পুলিশ আমাদিগকে শিক্ষা দিবেন, ধর্ম্মের অনুশাসনের আর বিশেষ প্রয়োজন হইবে না। লোক-শ্রেয়ঃ-সাধনের কার্য্যটীও গবর্নমেণ্ট বা সমাজ করিয়া দিবে। Father ডামিয়েন কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠা-পূর্ব্বক রোগীদের সেবা করিয়া অমর কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন, কিন্তু কালে গবর্নমেণ্টই সর্ব্বত্র এই প্রকার সেবার কার্য্য করিতে বাধ্য। খৃষ্টান ধর্ম্ম জন্মেছিল যখন রোম-সাম্রাজ্যে পাপের

---

* ইহুদী, খৃষ্ট ও ইসলাম ধর্ম্মের উৎপত্তি-সম্বন্ধে চিন্তা করিলে এই সকল ধর্ম্মের এক-পেশে ভাব হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। ইহুদীরা ছিলেন মিশরে একটী উৎপীড়িত ও উপদ্রুত জাতি, তাঁহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসে বহুমুখী কর্ম্ম বা জ্ঞানের সাধনা স্থান পাইতে পারে না, বিপন্ন লোক ঈশ্বরের প্রভুত্ব স্বীকারপূর্ব্বক তাঁহাকে উদ্ধারকর্ত্তা ও রক্ষাকর্ত্তা-রূপেই আহ্বান করে। খৃষ্টধর্ম্মও দুর্নীতিপূর্ণ, সমৃদ্ধ পাপকলুষিত রোমক-সাম্রাজ্যের উৎপীড়িত নিম্নশ্রেণীর প্রজাগণের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বর্গরাজ্যের পথ দেখাইয়াছে, তাই এই ধর্ম্মে নীতির উপদেশ প্রধান স্থান লাভ করিয়াছে। মুসলমান ধর্ম্ম আরবের মরুভূমিতে জন্মিয়া একের পূজাতে জোর দিয়াছে; মরুভূমির প্রকৃতিতে বৈচিত্র্যের বিশেষ স্থান নাই, বহুত্বও চিন্তাতে বিশেষ উদিত হয় না, তা ছাড়া একেশ্বরবাদী ইহুদী ও খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাবের আওতায় জন্মিয়া বহুত্বের কথা উত্থাপনই করিতে পারে না। হিন্দুধর্ম্ম হিন্দু জাতির গৌরবময় ইতিহাসের সহিত জড়িত এবং ইহাতে এত ব্যাপকতা রহিয়াছে যে মানব-চিত্তের সর্ব্বপ্রকার বৃত্তিই ইহার সাধনাতে স্থান পাইয়াছে। ইহাতে বাঁশ-পূজা এবং নির্গুণ ব্রহ্মবাদের স্থান রহিয়াছে। একেশ্বরবাদী ধর্ম্মসমূহের উৎপত্তির ইতিহাস একটু আলোচনা করিলে উল্লিখিত তত্ত্বগুলি কিছু বুঝা যায়। পরন্ত যে সকল ধর্ম্মে দল বাঁধিবার আবশ্যকতা প্রবলভাবে অনুভূত হয়, সেই সব ধর্ম্মে একনেতার আধিপত্য সর্ব্বথা গ্রহণীয় হইবে; 'এক কেতাব একনেতা, এক ঈশ্বরের অধীনতা' তাহাতে অত্যন্ত শ্রেয়: ও আদরণীয় বিবেচিত হইবেই। ধ্যানমূলক উপলব্ধি যে ধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য, তাহাতে দল বাঁধিবার চেষ্টা প্রবল হইতে পারে না, তাহাতে বৈচিত্র্য ও বহু সম্প্রদায় আপনিই গড়িয়া উঠিবে।

প্রাবল্য ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। লোকের দুশ্চরিত্রতা দেখিয়া রোমে কোন কোন সাধু stoic মানব-সমাজের ভবিষ্যৎ চিন্তাপূর্ব্বক হতাশ হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। তাই নীতিপ্রধান খৃষ্টধর্ম্ম রোম-সাম্রাজ্যে গৃহীত হয় এবং পতনোন্মুখ রোম-সাম্রাজ্যকে নব শক্তি দান করিয়া তাহাতে নব জীবন সঞ্চার করিয়া দেয়। মরুভূমিতে একের চিন্তা হৃদয়ে গভীরভাবে জাগরিত হয়, তাই আরবের মরুভূমিতে উৎকট একতামূলক ইস্‌লাম ধর্ম্মের জন্ম। এদেশে প্রকতির অসাধারণ বৈচিত্র্য, চন্দ্র-সূর্য্যাদি গ্রহনক্ষত্রের অপার সৌন্দর্য্য এবং নদী, বন, গিরিমালা ও স্বপ্নরাজ্যের অপূর্ব্ব শোভা বর্ত্তমান, কাজেই হিন্দু ধর্ম্মে আনন্দের সাধনা। ঋষিও তাই বলিলেন, "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি", এই মহাবাক্য অন্য কোন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতার মুখে উচ্চারিত হইতে পারে না। এই ধর্ম্মের জন্ম দুঃখের মধ্যে নহে, প্রাচুর্য্য ও শোভা-সৌন্দর্য্যের মধ্যে। ইহাতে নীতির আবশ্যকতা স্বীকৃত হইয়াছে, কেননা মানুষ যে পুণ্যপথ জানিয়াও প্রবৃত্তির তাড়নায় পাপ-পথে বিচরণ করে, সত্য হইতে ভ্রষ্ট হয়, তাহা ঋষিরা জানিতেন। তাই তাঁহারা দেবতাকে "পাপনুদঃ" নাম দিলেন, কেননা ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়াই পাপ বর্জ্জন করিতে পারা যায়। আমার দৃঢ় ধারণা, যে সব ধর্ম্মে নীতিকে প্রধান করিয়া তোলা হয়, সেই সব ধর্ম্ম কাল-ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে এবং যে ধর্ম্মে আত্মার অন্বেষণকে প্রধান স্থান দেওয়া হইবে, তাহা স্থায়িত্বলাভ করিবে, কেননা আত্মার অন্বেষণের জন্য এক জীবন কেন অনন্তকোটী জীবনও যথেষ্ট নহে। হিন্দুধর্ম্মে কাজেই দেহকে ধর্ম্ম-সাধনের করণ বা সহায়রূপে দেখা হইয়াছে এবং দেহ ব্যতীতও সাধন চলিতে পারে, বিশ্বাস করা হয়। হিন্দুধর্ম্মে আত্মার অন্বেষণই প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া রহিয়াছে। উপনিষদে নীতির আবশ্যকতা এই ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে—

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥

যে দুশ্চরিত্রতা বর্জ্জন করিতে পারে নাই, যাহার চিত্ত শান্ত অর্থাৎ কাম-ক্রোধ জয় করিয়া বিকার-রহিত হয় নাই, যাহার মন কামনা বর্জ্জন করিয়া শান্তভাব প্রাপ্ত হয় নাই, সে কেবল জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারিবে না। মানুষের মনকে বিশ্লেষণ করিয়া ঋষি বলিলেন, "তোমার ইন্দ্রিয়গুলি অশ্ব এবং তোমার মন তোমার দেহরথের সারথী। সারথী যেরূপে অশ্বগণকে সংযত রাখে সেই ভাবে তোমার ইন্দ্রিয়গণকে সংযত কর।" লোভের প্ররোচনা-বশতঃ মানুষ সকল প্রকারের পাপ করে, তাই গীতাকার বলিলেন—

"লোভাৎ ক্রোধঃ প্রভবতি লোভাৎ কামঃ প্রজায়তে।
লোভান্ মোহশ্চ নাশশ্চ, লোভঃ পাপস্য কারণম্॥"

কাজেই লোভ সংবরণ করিতে হইবে এবং বিধি অনুসারে ভোগ করিতে হইবে। নীতি-বিষয়ে shall not না বলিয়া তাঁহারা বিধিলিঙ্ এর প্রয়োগ করিয়াছেন, কেননা নীতি-বিষয়ে লোককে স্বাধীনতা দিতে হইবে। নীতির নীতিবত্তা নষ্ট হইয়া যায় dictatorগিরিদ্বারা। স্বর্গ ও নরকের লোভ বা ভয় দ্বারা যে ধর্ম্ম বা নীতি শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা ত বালকের পক্ষেই প্রয়োজ্য। যে ধর্ম্মসমূহে কেবল নীতির উপর জোর দিয়া ঈশ্বরকে একজন অলৌকিক ক্ষমতাপন্ন শাসন-কর্ত্তা-রূপে আকাশে স্থাপন করা হয়, বিজ্ঞানের ও শাসনকার্য্যের উন্নতিলাভ হইলে, সেই সব ধর্ম্মে লোকের বিশ্বাস দৃঢ় থাকিবে না। বৈদিক ধর্ম্মে ঈশ্বরকে প্রাণের প্রাণরূপে লাভ করার

কথাই অধিক বলা হইয়াছে এবং তজ্জন্য ধ্যানের বা গভীর চিন্তার সাধনাই প্রধান সাধনা হইয়া রহিয়াছে। ঈশোপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন—

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্ ॥
কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে ॥

—জগতে যাহা কিছু প্রপঞ্চভূত চঞ্চল বিষয় আছে, সেই সমুদয়কে পরমেশ্বর দ্বারা আচ্ছাদন করিতে হইবে, অর্থাৎ সমস্তই ব্রহ্মময় এরূপ জানিয়া বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ করিতে হইবে। সেই ত্যাগ দ্বারা অর্থাৎ বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া পরমাত্মাকে সম্ভোগ কর, কাহারও ধনে আকাঙ্ক্ষা করিও না। মনুষ্য কর্ম্ম করিয়াই ইহলোকে শতবৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে। হে মনুষ্য, এরূপ করিলে তোমাতে কর্ম্ম লিপ্ত হইবে না (অর্থাৎ তুমি অশুভ কর্ম্মে লিপ্ত হইবে না) ; ইহা ব্যতীত অন্য পথ নাই [তত্ত্বভূষণ]। এই দুইটী শ্লোকে ধর্ম্ম-সাধনার ও নীতিশাস্ত্রের মূল সত্য অতীব সংক্ষেপে প্রকাশ করা হইয়াছে। ঋষি বহুকাল-সাধনলব্ধ সত্য আমাদিগকে ৪টী ছত্রে বলিয়া দিলেন। নানা প্রকার ভৌতিক বিজ্ঞানের তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া তাঁহাকেই জানিতে হইবে। জগতের সকল বস্তুতেই তিনি আছেন। বিজ্ঞান তাঁহারই জ্ঞানকে আবিষ্কার করিতেছে। তাঁহার সৃষ্টি-কৌশলই আমাদের অন্বেষ্টব্য। বিষয়বুদ্ধিকে সংযত রাখা যায়, যদি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে ঈশ্বরের লীলা ও সৃষ্টি-কৌশল দেখা হয়। অন্যের ধনেও লোভ থাকে না। ঋষি কর্ম্ম করিয়াই জীবন ধারণ করিতে উপদেশ দিলেন এবং শতায়ু লাভ করিতে হইলে কর্ম্মের প্রয়োজন তাহাও বলিলেন। এই ভাবে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের উপদেশ দিয়া দিলেন। ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য চিন্তা করিয়া তাঁহার সৃষ্টিকৌশল বুঝিবার চেষ্টা করিয়া, এবং জীবনের অন্যান্য কর্ত্তব্য সাধন করিয়া জীবন ধারণ করিতে হইবে। এই উপদেশের মধ্যে লোকশ্রেয়ঃ-সাধনের ব্যবস্থাও আছে। কাজ করিতে গেলেই সমাজরক্ষা যাহাতে হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। যদি সমাজের কাজ না করা হয় তবে কেবল নিজের দেহরক্ষার জন্য কাজ করা যায় না। কেননা মানুষ সামাজিক জীব।

এদেশের ধর্ম্মচিন্তায় ও ধর্ম্মসাধনায় প্রাচীন যুগ হইতে একটা উদার ভাব বর্ত্তমান দেখা যায়। বৈদিক মন্ত্রগুলি হাজার হাজার পুরুষ ও নারী কর্ত্তৃক রচিত মনে হয়, যদিও বেদে আমরা কয়েক জন প্রধান প্রধান ঋষির নাম পাঠ করি। এই সব মন্ত্র এক যুগে বা এক জনের দ্বারা রচিত হয় নাই, অথচ সকলের চিন্তাই এক খাতে প্রবাহিত। এক ব্রহ্মসত্তা যে সকল সত্তার মূল, এক ঈশ্বর হইতেই যে জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয় হইতেছে—এই সত্য আজও সকলের চিত্তে উদ্ভাসিত রহিয়াছে। ঋষিরা বহু দেবতাকে আহ্বান করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা সকলে যে এক দেবতারই বহু ভাবের প্রকাশ, তাহা শীঘ্রই তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। প্রকৃতিতে যে নানা ঋতুর পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে তাহাত সকলেই দেখে, কিন্তু তথাপি প্রকৃতিতে যে একত্ব বর্ত্তমান তাহা ত অনায়াসেই বুঝা যায়। নিজের মধ্যেও এই একত্ব সহজ-বোধ্য। প্রকৃতির মধ্যে যে অলঙ্ঘনীয় নিয়ম রহিয়াছে তাহাও বুঝা যায়। তাই ঋষিরা "ঋতং" এবং "সত্যং" এক বুঝিলেন। তাঁহারা "ঋতং" বলিতে প্রকৃতির অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মসমূহ বুঝিতেন এবং তাহাই "সত্য" বলিয়া দেখিতেন। জগতে দৈবশক্তির খেলা দেখিয়াই তাঁহারা এই ভাবে ভক্তির সহিত দেবতাদিগকে আহ্বান করিয়া কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য প্রদান করিতেন। বেদগুলি কর্ম্মকাণ্ড-প্রধান, অর্থাৎ তাহাতে নানা প্রকার যাগ-যজ্ঞ বা পূজাপদ্ধতির

ব্যবস্থা রহিয়াছে সত্য, কিন্তু দেবতাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা-প্রকাশই প্রধান উদ্দেশ্য এবং তাঁহাদের কৃপা ভিক্ষা করাই আবশ্যক মনে হইত। এই কৃতজ্ঞতাই ধর্ম্ম-বিশ্বাসের ভিত্তি। জল, অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি দেবতারা আমাদের উপকার সাধন করিতেছেন। এই যে কৃতজ্ঞতা তাহাই বহু কবিতার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতেছে। বৈদিক ঋষিরা সকলেই কবিভাবাপন্ন। বিশ্বের সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাঁহারা মুগ্ধ হইয়াছেন। উষার এইরূপ বর্ণনা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। গ্রীসে বা অন্যান্য প্রাচীন সভ্যদেশেও প্রকৃতির দেবতা-সমূহের পূজা প্রবর্ত্তিত ছিল সত্য, কিন্তু এত বিস্ময় ও এত কৃতজ্ঞতার ভাব কোথাও মেলে নাই। মহামতি কার্লাইল বলেন যে "বিস্ময়ের ভাবই" পূজার ভাব। সৃষ্টি দেখিয়া বিধাতার অপূর্ব্ব কৌশল ও কৃপা দেখিতে হয় এবং তাহাতে হৃদয় বিস্ময়-রসে আপ্লুত হয়। এদেশের নদী, পর্ব্বত ও অন্য প্রকারের শোভা-সৌন্দর্য্য সবই বিস্ময়ের বিষয়। খণ্ডেতে অখণ্ডকে দেখা হিন্দু আত্মার স্বভাব। ৺রবীন্দ্রনাথও এই ভাবেই নিতান্ত সাধারণ বস্তুতে অসাধারণকে দেখিতেন, তাঁহার অনেক কবিতা স্থূলদৃষ্টিতে নিতান্ত গদ্যময় মনে হয়, কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে তিনি "পাতা নড়ে," "ফুল ফোটে," "নদী বহিয়া যায়," ইহাতেও সকল নড়ার বা সকল স্পন্দনের মূল যে চেতনা তাঁহাকে দেখিতেন। জগতের ধূলিকণাকেও যখন অসীমের সঙ্গে যুক্ত দেখা যায়, তখন তাহা পদ্যময় হইয়া উঠে। ইহাকেই বলে বৈদিক দৃষ্টি। গীতাতে যে বিভূতিযোগ-নামক অধ্যায়টী আছে তাহা পাঠ করিলেই "বিস্ময়ের ভাব" কাহাকে বলে তাহা বুঝা যায়।

এই বৈদিক দৃষ্টি আজও সাধারণ লোকের মনে ক্রিয়া করে; তাই তাহারা বিজ্ঞানের উপদেশ বুঝিতে পারে না, তীর্থস্থানে যাইয়া নদী, প্রস্রবণ ইত্যাদির অপূর্ব্ব লীলা দেখে ও ভক্তিপ্রণত হয়; সমুদ্রের ঢেউ দেখিয়া ভীত ও ত্রস্ত হয় এবং পূজা দিতে অগ্রসর হয়।

চিন্তার গভীরতা লাভ হওয়ার পর ঋষিরা দেখিলেন যে বহির্জগতের সত্তা আমার মনের উপর নির্ভর করিতেছে এবং তজ্জন্য বাহিরের দেবতাকে তাঁহারা অন্তরে দেখিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, "যে জগৎ দেখিতেছি, শুনিতেছি, আঘ্রাণ ও আস্বাদন করিতেছি তাহা ত আমার ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের উপর নির্ভর করে।" তাই তাঁহারা জ্ঞান বিশ্লেষণ করিতে লাগিলেন এবং এই বিশ্লেষণ-ব্যাপারে বহুকাল অতিবাহিত হইল। বৈদিক দৃষ্টিতেই জগতে তাঁহারা দেবতার খেলা বাহিরে দেখিয়াছিলেন, ক্রমে দেখিলেন যে বহির্জগতের খেলা ত আমার মনে সংঘটিত হইতেছে—এইটী হ'ল বৈদান্তিক দৃষ্টি। উপনিষৎসমূহ এই বৈদান্তিক বা আত্মিক দৃষ্টির ফল। ইহাতে জগৎ অনিত্য এবং অসত্য হইলেও ব্রহ্মতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া সমস্ত হিন্দু-শাস্ত্র এক সূত্রে গ্রথিত। বৈদিক দৃষ্টি এবং বৈদান্তিক দৃষ্টিই লোকশিক্ষার জন্য পৌরাণিক দৃষ্টিতে পরিণত হইয়া নানা উপাখ্যান, গল্প, গাথা সৃষ্টি করিয়া মানব-সমাজে ঈশ্বরের কার্য্য বর্ণনা করিল। বৈদিক সময়ে যে দেবতাকে বাহিরে দেখিলাম, বৈদান্তিক সময়ে তাঁহাকে "অন্তরতর অন্তরতম"রূপে লাভ করিলাম। পৌরাণিক ভাবে তাঁহাকে মানুষের সমাজে, মানুষ-ভাবে আমাদের সঙ্গে এক হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করার জন্য রাম, কৃষ্ণ ইত্যাদি অবতাররূপে যুদ্ধাদি-কার্য্যে সহায়রূপে পাইলাম। তাই গীতা বলিলেন—যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ এই ভাবে যদি আপনারা বেদ, বেদান্ত বা উপনিষৎ ও পুরাণগুলিকে এক সূত্রে গ্রথিত দেখিতে পারেন, তখন দেখিবেন যে এক তত্ত্ব সমস্ত হিন্দু-শাস্ত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। পুরাণ, তন্ত্র, বৈষ্ণবশাস্ত্র প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্র উপনিষদের মূল তত্ত্বের সহিত অন্বিত। কেবল আধুনিক শাস্ত্রে ভক্তির ভাব শিক্ষা দেবার জন্য নানা ভাবের কল্পনার আশ্রয় লওয়া হইয়াছে। ভক্তির পরাকাষ্ঠাকেই বলে "ব্রজের ভাব।"

গোপিকারা তাঁহাকে প্রাণপতি-রূপে দেখিয়াছেন, তাই ভাগবতে গোপিকাদিগকে এই ভাবে প্রশংসা করা হইয়াছে :

ভগবত্যুত্তমশ্লোকে ভবতীভিরনুত্তমা ।
ভক্তিঃ প্রবর্ত্তিতা দিষ্ট্যা মুনীনামপি দুর্লভা ॥

[উত্তমশ্লোক ভগবানে মননশীলদিগেরও দুর্ল্লভা যে অনুত্তমা ভক্তি, তাহা আপনাদের দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ।—উপাধ্যায়]

সেই ভক্তি কিরূপ তাহা দেখিবার জন্য আবার বলিতেছেন :

দিষ্ট্যা পুত্রান্ পতীন্ দেহান্ স্বজনান্ ভবনানি চ ।
হিত্বা বৃণীত যূয়ং যৎ কৃষ্ণাখ্যং পুরুষং পরম্ ॥

[সৌভাগ্যবশতঃ আপনারা পুত্র, পতি, স্বজন, দেহ এবং বাসভবনের প্রতি আসক্তি-পরিশূন্য হইয়া কৃষ্ণাখ্য পরমপুরুষকে বরণ করিয়াছেন ।]

এইভাবে সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবানে আত্মসমর্পণ আমাদের দেশীয় ভক্তির পরাকাষ্ঠা। বৈদিকযুগে লোকেরা যেরূপ আগ্রহের সহিত দেবতাদিগকে আহ্বান করিতেন, আজও সেই আগ্রহই নানারূপ আচার-অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া প্রকাশ পায় । কিন্তু সমস্তের মূল তত্ত্ব এক । জগৎ যে ব্রহ্মময় তাহা আজও লোকেরা বিশ্বাস করে । তৈত্তিরীয় উপনিষদে ঋষি শিক্ষা দিলেন "সোঽকাময়ত বহু স্যাম্ । প্রজায়েয়েতি ; স তপোঽতপ্যত, স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমস্জত যদিদং কিঞ্চ । তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানু প্রাবিশৎ ।" তিনি অর্থাৎ পরমাত্মা ইচ্ছা করিলেন আমি বহু হইব, আমি উৎপন্ন হইব। তিনি তপস্যা করিলেন অর্থাৎ সৃজ্যমান জগতের রচনাদি-সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন । তিনি তপস্যা করিয়া এই যাহা কিছু আছে, সমস্ত সৃষ্টি করিলেন । তাহা সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন ।—তত্ত্বভূষণ । ইহাতে জগৎ সত্য এবং মিথ্যা এই উভয় বিরোধী ভাবের মীমাংসা হইয়া গেল । বিজ্ঞান এই বিশ্বাসের মূল সত্য অস্বীকার করিতে পারে নাই । ভৌতিক পদার্থ যে কি তাহার শেষ মীমাংসা বিজ্ঞানে হয় নাই । কাজেই ভৌতিক পদার্থও যে আত্মিক ভাবাপন্ন নহে, বিজ্ঞান তাহা বলে না । বিজ্ঞান এখন বলে যে matter এবং mind একই সত্তার ভিন্ন ভিন্ন দিক্ মাত্র । যাহা matter তাহাও mind-ভাবাপন্ন ।

ঋষিগণ উল্লিখিত ভাবাপন্ন আত্মিক সাধনার ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । এদেশে ঋগ্বেদের সময়েই শিক্ষার একটী পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত দেখা যায় । বালকেরা গুরুগৃহে বাস করিয়া জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের সাধনা শিক্ষা করিতেন । অষ্টম বর্ষেই তাঁহারা গুরু-সন্নিধানে উপনীত হইয়া গায়ত্রী-মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিতেন ও ঈশ্বর-চিন্তা করার রীতি বুঝিয়া লইতেন । আমাদের ধীশক্তি যিনি পরিচালনা করিতেছেন, তিনিই তিন লোকে পরিব্যাপ্ত ; আমরা তাঁহাকে সকল সময়েই বাহিরে দেখি, কিন্তু ধ্যানে তাঁহাকে অন্তরে লাভ করি । জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহ-সম্বন্ধেও তাঁহাদের এক একটা ব্যবসায় নির্দ্দিষ্ট থাকাতে জীবনের আদর্শ ঠিক ছিল, তাহাতে প্রাণে স্থৈর্য্য ও শান্তি বর্ত্তমান ছিল । নিজের বৃত্তি লাভজনক হউক বা না হউক তাহাকেই ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে হইত । ইহাতে জীবন-ধারণ ধর্ম্মের জন্য এই বিশ্বাস হৃদয়ে দৃঢ়তা লাভ করিত । স্ব স্ব ব্যবসায়ে উন্নতি-লাভ করার চেষ্টা হইতেই নানা বিদ্যায় উৎকর্ষ-লাভ হইয়াছে । অর্থে লোভ ছিল না, একথা বলা যায় না,

কেননা মানুষের প্রকৃতি ভোগপ্রবণ। স্ত্রী-পুত্র লইয়া সুখে থাকিতে সকলেই চেষ্টা করে এবং চিরকালই করিবে। তাহাতে প্রতিযোগিতাও অনিবার্য্য। কিন্তু তথাপি অর্থোপার্জনেও শাস্ত্রের বিধান মানিয়াই লোকদিগকে চলিতে হইত। শক্তির তারতম্য সর্ব্বদাই দেখা যায়, কাজেই শক্তিমানেরা অধিক আদৃত ও সম্মানিত হইয়াছেন। কিন্তু ধার্ম্মিক ও জ্ঞানী লোকেরাই সমাজের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। যাঁহারা দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া জ্ঞান ও ধর্ম্মানুশীলনে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারাই সকলকে পথ দেখাইতেন। তাহাতে এই দেশে অর্থের গৌরব বিশেষ ছিল না এবং অর্থলাভের জন্য লোক এত ছুটাছুটী করিত না। কার্ল মার্ক্স্ যে ভাবে সভ্যতার ভিত্তিতে অর্থের শক্তির খেলা দেখিয়াছেন, এদেশের সভ্যতা-সম্বন্ধে সেই মতবাদ প্রযোজ্য মনে হয় না। আজও অর্থদ্বারাই সকল প্রকারের প্রাধান্য এদেশে লাভ করা যায় না। জ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রতি এদেশে যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়, তাহা অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রবর্ত্তিত দেখা যায়। ধর্ম্মশিক্ষারও যেরূপ ব্যবস্থা এখানে রহিয়াছে তদনুরূপ পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা অন্যত্র সাধিত হয় নাই।

এই পূর্ণাঙ্গ-সাধন জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের সমন্বয়-দ্বারা সাধিত হয়, গীতা এই শিক্ষা দিয়াছেন। এদেশে জ্ঞান-সাধনা বলিতে কেবল ভৌতিক বিজ্ঞানের আলোচনা বুঝাইত না, যদিও সকল প্রকারের জ্ঞানই সাধনীয় ছিল। আমরা যে ভাবে দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য ও বিজ্ঞান অধ্যয়ন করি, এই প্রকার জ্ঞানানুশীলনকে ঋষিরা অপরা বা অশ্রেষ্ঠা বিদ্যার চর্চা বলিতেন এবং যাহাতে ব্রহ্মতত্ত্ব-বিচার-পূর্ব্বক ব্রহ্মলাভের চেষ্টা করা হইত, তাহাকে পরা বিদ্যা বলিতেন। অধিকাংশ লোক তৎকাল-প্রচলিত নানা বিদ্যা অর্জন করিয়া আমাদের ন্যায়ই জীবিকার্জনে প্রবৃত্ত হইতেন এবং সাংসারিক সুখসৌভাগ্য-বর্দ্ধনে মনোযোগী হইতেন। কেহ কেহ পক্ষান্তরে যৌবনেই ঈশ্বর-লাভের জন্য স্নাতক হইতেন এবং চিরকাল গুরুগৃহে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেন বা প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেন। এইরূপ আবাল্য ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারী লোক কদাচিৎ দেখা যাইত। উপনিষদের ঋষি এইরূপ "শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য" অর্থাৎ কামনা-বর্জিত বেদজ্ঞ বা জ্ঞানীর সুখকে সকল প্রকারের সুখ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন। এইরূপ নিবৃত্তি-মার্গাবলম্বী লোকদিগকে আমরাও "মহারাজ" বলিয়া থাকি। সন্ন্যাসীদিগকে যে আমরা মহারাজ বলি সেই ভাবটী বোধ হয় উপনিষদের সময় হইতেই প্রবর্ত্তিত। নিম্নে আমি উপনিষদের বাক্যগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি। যুবা স্যাৎ সাধুযুবাধ্যায়কঃ। আশিষ্ঠো দৃঢ়িষ্ঠো, বলিষ্ঠঃ। তস্যেয়ং পৃথিবী সর্ব্বা বিত্তস্য পূর্ণা স্যাৎ। স একো মানুষঃ আনন্দঃ। তে যে শতং মানুষা আনন্দাঃ। স একো মনুষ্যগন্ধর্ব্বাণামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং মনুষ্যগন্ধর্ব্বাণামানন্দাঃ স একো দেবগন্ধর্ব্বাণামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং দেবগন্ধর্ব্বাণামানন্দাঃ। স্বকীয়ং কর্ম্ম করোতি ইতি।

অর্থাৎ সেই ব্রহ্মের আনন্দের এই মীমাংসা অর্থাৎ বিচার করা যাইতেছে। মনে কর যেন একজন বেদজ্ঞ ক্ষিপ্রকর্ম্মা দ্রঢ়িষ্ঠ এবং বলিষ্ঠ যুবক আছে, এবং এই বিত্তপূর্ণ সমস্ত পৃথিবী তাহার। ইহা অর্থাৎ এইরূপ যুবকের আনন্দ এক পূর্ণমাত্রা মানবীয় আনন্দ। এরূপ মানবীয় আনন্দের শতগুণ মনুষ্যগন্ধর্ব্বের এক পূর্ণমাত্রা আনন্দ অথাৎ মনুষ্যগন্ধর্ব্বের আনন্দ মানবীয় আনন্দের শতগুণ (বিশেষ কর্ম্ম বা জ্ঞানবশতঃ গন্ধর্ব্বত্বপ্রাপ্ত মনুষ্যকে মনুষ্যগন্ধর্ব্ব বলে। কামনামুক্ত বেদজ্ঞ বা শ্রোত্রিয় পুরুষেরও সেই পরিমাণ আনন্দ। মনুষ্যগন্ধর্ব্বের শতগুণ আনন্দ এক পূর্ণমাত্রা দেবগন্ধর্ব্বের আনন্দ (দেবগন্ধর্ব্ব এক জাতীয় জীব)। কামনামুক্ত শ্রোত্রিয় পুরুষেরও সেইরূপ আনন্দ।

কামনা জয় করিয়া জ্ঞানে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়—এই সাধনাই এদেশের শ্রেষ্ঠ সাধনা। আমাদের তান্ত্রিক সাধকগণও নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মের সহিত যোগই সাধনা করেন। তাঁহারা "অবিদ্যাস্মিতা-রাগদ্বেষাভিনিবেশ" নামক পঞ্চক্লেশ নিবারণের জন্য "সোঽহং বা সাহং" অর্থাৎ ঈশ্বরকে অহং এর ভিতর লাভ করিয়া একাত্মতা সাধন করেন। জ্ঞানানুশীলন দ্বারা ঈশ্বরলাভের উপদেশ শাস্ত্রেই দেখা যায়। অন্য শাস্ত্রে তাহা নাই।

কর্ম্মসাধনা—বেদকে কর্ম্মকাণ্ড বলা হইয়াছে, কেননা তাহাতে নানারূপ যজ্ঞাদির ব্যবস্থা দেখা যায়। এই সকল যজ্ঞ সাধনের জন্য বেদের ব্রাহ্মণভাগে তাহার প্রক্রিয়াসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তজ্জন্য বিশেষজ্ঞ পুরোহিতগণের প্রয়োজন হইয়াছে। যাঁহারা এই বিষয়ে দক্ষতালাভ করিতেন, তাঁহারাই পরে ক্রমশঃ একটী বিশেষ শ্রেণী হইয়া ব্রাহ্মণজাতি গঠন করিয়াছেন। সকল সময়েই কার্য্যের সুবিধার জন্য বিশেষজ্ঞ শ্রেণীর প্রয়োজন রহিয়াছে। প্রাচীন সময়ের শিক্ষা দ্বারা যেভাবে শ্রেণী-বিভাগ হইয়াছিল তাহাতে জাতি বা caste গড়িয়াছে। এখনও হিন্দুদের মধ্যে বেদ ও বৈদিক ক্রিয়াতে লোকের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আছে। তজ্জন্য একটা রক্ষণশীলতা ও স্থিতিশীলতা সমাজে বিরাজ করিতেছে। আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াতে লোকের শ্রদ্ধা থাকাতে ধর্ম্মবিশ্বাস গড়িবার সুবিধা রহিয়াছে। কিন্তু কর্ম্ম বিষ্ণুতে অর্পিত না হইলে কর্ম্ম মুক্তি দিতে পারে না, বন্ধনই জন্মায়।

হিন্দুধর্ম্মের বিধানগুলি এত জটিল ও বহু শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত যে হিন্দুধর্ম্মের তুলনা হিমালয়ের সহিত করা যাইতে পারে। হিমালয় যে ভাবে আমাদের দৈহিক জীবনের রক্ষা ও পালন বিধান করিতেছেন, তাহা নিতান্ত বিস্ময়ের বিষয়। এই সভ্যতাকে হিমালয় যে অত্যুচ্চ প্রাচীরস্বরূপ হইয়া শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছেন, তাহাত সকলেই দেখিতেছেন; এমন কি কেহ কেহ বলেন যে আমরা যে এখনও বাঁচিয়া আছি, তাহা আমাদিগের ভৌগোলিক সংস্থানবশতঃ। সমুদ্র ও হিমাচল আমাদিগকে রক্ষা না করিলে মধ্য এশিয়াবাসিগণের অবাধ আক্রমণে আমরা বিধ্বস্ত হইয়া যাইতাম। ইহাতে অনেকখানি সত্য নিহিত আছে। হিমালয় যদি মেঘগুলির পথে বাধা না দিতেন, তাহা হইলে আমাদের দেশে এত বৃষ্টি ও এত উর্ব্বরতালাভ সম্ভব হইত না। হিমালয়োদ্ভূত নদীসমূহ দ্বারাই উত্তর ভারত সিক্ত হইয়া উর্ব্বরতালাভ করিয়াছে এবং এই সভ্যতা গড়িয়াছে। হিন্দু সভ্যতা উত্তর ভারত হইতেই দক্ষিণ ভারতে বিস্তৃত হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষে এক কৃষ্টি ও এক জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। হিমালয়কে যে দেবতাদের আবাসরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্র অত্যুক্তি নাই। হিমালয় আজও সাধু-সন্ন্যাসিগণের সাধনক্ষেত্র। হিমালয় হইতেই ব্রহ্মবিদ্যা আসিয়াছেন। তাই উপনিষদে উমা বা হৈমবতীকে ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী বলা হইয়াছে। বাঙ্গলার ঘরে ঘরে যে হিমালয়-দুহিতার পূজা হয় তাহা ব্রহ্মবিদ্যারই পুরাণে বর্ণিত একটী রূপকের পূজা। এই ব্রহ্মবিদ্যা শিব বা সাধকগণের সাধনার বস্তু। মহাদেব যোগী-শ্রেষ্ঠ এবং হিমালয় এই যোগী-শ্রেষ্ঠের আবাসস্থল। হিমালয়ের নিকট যে আমরা কি ভাবে ঋণী তাহার বর্ণনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সন্তোষজনকভাবে করা সম্ভব নয়। হিমালয়ের যে তিনটী অত্যুচ্চ শিখর তাহা পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতশিখর ও চিরতুষারাবৃত এবং বহিরাকারে একরূপ। হিন্দুধর্ম্মেরও জ্ঞান-ভক্তি কর্ম্মরূপ তিন চূড়া পৃথিবীর অন্য সকল প্রকারের জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মসাধনা অপেক্ষা প্রশস্ততর এবং উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত। হিমালয়ের চূড়াগুলি যে ভাবে চিরতুষারাবৃত ও ধবল এবং একাকার, হিন্দুধর্ম্মের এই তিন মার্গই একভাবে ঈশ্বরলাভের সহায়। উচ্চতার দিক দিয়া কাঞ্চনজঙ্ঘা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ এই তিন মার্গের মধ্যে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা সুধীগণের স্বীকার্য্য। গীতাতে যে ভাবে তিন মার্গের পরস্পর যোগ ও বিশ্লেষণ করা হইয়াছে, তাহা জগতের অন্য

কোনো ধর্ম্মগ্রন্থে পাঠ করি নাই। গ্রন্থকার এই তিনটী মার্গের বিষয়ে যে গভীর চিন্তা করিয়াছেন, তাহা জগতে অতুলনীয়। মীমাংসকেরা যে ভাবে কর্ম্মকাণ্ডের বিচার করিয়াছেন, এইরূপ বিচার অন্য কোনো কর্ম্মকাণ্ডে দেখা যায় না। বৈদিক ক্রিয়া যদি শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে চিত্তশুদ্ধি-লাভ হয় এবং ভগবানে যাঁহারা কর্ম্ম অর্পণ করিতে পারেন তাঁহাদের আপনা হইতেই জ্ঞানের উদয় হয় এবং ভক্তিও লাভ হয়। গীতা বলিতেছেন—"কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ" অর্থাৎ যাঁহারা জ্ঞান লাভ করেন তাঁহাদেরও কর্ম্মানুষ্ঠান-দ্বারা সংসার-স্থিতির ব্যবস্থা করিতে হয়। সংসারে স্থিতির জন্যই আমরা কর্ম্ম করি। সমাজরক্ষার যে সব কর্ম্মে আজকাল খুব জোর দেওয়া হয় এবং যাহাতে ইউরোপের শ্রেষ্ঠতা লাভ হইয়াছে বলা হয়, তাহাও কর্ম্মের সীমাতেই আবদ্ধ। কেননা কর্ম্ম ব্যতীত গার্হস্থ্য-জীবন চলে না এবং গার্হস্থ্য-জীবনই চতুরাশ্রমের প্রধান আশ্রম। ঋষিরা আশ্রম-বিভাগ করিয়া জীবনের ক্রমোন্নতি-বিধানের যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাতেই যে মানবের একটা পূর্ণতা লাভ হইতে পারে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাঁহারা Sermon on the Mount এর নীতির শ্রেষ্ঠতার কথা বলেন, তাঁহাদিগকে বিনীতভাবে বলিতে চাই যে বাইবেলে কতকগুলি নীতির একত্র সমাবেশ মাত্র করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ নীতি হিন্দু-শাস্ত্রের বহুস্থলে লিখিত আছে। মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব বা বনপর্ব্বে এই প্রকার বহু নৈতিক তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। কিরূপে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইবে, গীতা সেই পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। বাইবেলে যে ত্যাগের ও ভক্তির কথা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তাহার অবলম্বন সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। ত্যাগ শিক্ষা দিতে হয়, এবং ক্রমশঃ ত্যাগের শক্তি লাভ করা যায়। ভোগের ভিতর দিয়া ত্যাগে পৌঁছিতে হয়। গভীর ভাবে বিচার করিলে আশ্রম-বিভাগের অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এদেশের রাজারাও ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক দেহপাত করিতে প্রয়াস পাইতেন। "কর্ম্ম" করিয়াই 'অকর্ম্ম' কি বুঝিতে হয়। গীতা তজ্জন্য বলিয়াছেন "গহনা কর্ম্মণো গতিঃ।" পরবর্ত্তী প্রবন্ধে এই সম্বন্ধে আরো কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

জ্ঞানের সাধনা-সম্বন্ধে উপরে যাহা বলিয়াছি তাহাও যথেষ্ট নহে, এবং এই সম্বন্ধে বিশেষ বলা আমার ক্ষমতার বাহিরে, কেননা জ্ঞানের কথা সম্যক্ বুঝাইতে হইলে হিন্দু দর্শনের বিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। আমি শুধু জ্ঞান-সাধনাতে যে কিরূপ কঠোর পরিশ্রম এদেশে করা হইয়াছে সেই কথাই উত্থাপন করিতে চাই, কেননা আজকাল "অর্থকরী বিদ্যা চাই", "অর্থকরী বিদ্যা চাই", এই কথাটা আমাদের তথাকথিত শিক্ষিতগণ এত বলেন যে তাহাতে সময়ে সময়ে ধৈর্য্য রাখা কঠিন হয়। য়ুনিভারসিটীর সমাবর্ত্তন উপলক্ষে জ্ঞানের দ্বারা যে চিত্তশুদ্ধি ও আত্মিক মুক্তি লাভ হইতে পারে এ সকল কথার উল্লেখমাত্রও থাকে না। দর্শন-জ্ঞান যে ধর্ম্মের ভিত্তি এই কথাটাই পণ্ডিতেরাও স্বীকার করেন না। ধর্ম্মবিশ্বাস যেন একটা কারণ-বিহীন অনুমান মাত্র, এই ভাবে অনেকে কথা বলেন। শাস্ত্র-জল্পনা বৃথা, ধর্ম্মবিশ্বাস আমাদের হৃদয়ে স্বতঃ উৎসারিত হয়, ইহাতে অধ্যয়নের ও চিন্তার বিশেষ প্রয়োজন নাই, ধর্ম্ম-সাধনেরও প্রয়োজন নাই, এই ভাবের কথাই অধিক শুনিতে পাই। হিন্দুশাস্ত্র, বিশেষতঃ উপনিষদাদি পাঠ করিলে দেখিতে পাই যে ঋষিগণ কি কঠোর সাধনা করিয়াছেন। কেহ কেহ সারা জীবন ব্রহ্মচর্য্য সাধন করিয়া জ্ঞানলাভের চেষ্টা করিতেন। হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় এইরূপ যুক্তিমূলক ধর্ম্ম আর কোথাও গড়িয়া উঠে নাই, কাজেই বৈজ্ঞানিক যুক্তিকে অন্যান্য ধর্ম্মাবশ্বাসিগণ ভয় করেন। হিন্দুধর্ম্মের যে প্রধান গ্রন্থ বেদান্ত বা উপনিষৎ তাহার সত্যসমূহকে অবলম্বন করিয়া দর্শনগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে এবং দর্শন-বিচারের প্রয়োজন সেই সত্যগুলি সম্যক্রূপে বুঝিবার

জন্য। ঋষিগণ যে সকল মহাবাক্য সাধনা-দ্বারা লাভ করিয়াছিলেন, শঙ্কর প্রভৃতি আচার্য্যগণ সেই গুলিরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঋষিগণ যেরূপ স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়াছেন আমাদিগকেও সেইরূপ নিজ চিন্তা-দ্বারাই সত্য বুঝিতে হইবে। যে ধর্ম্মের গোড়া-পত্তন এই ভাবের স্বাধীন চিন্তার উপর, সেই ধর্ম্মের সাধকগণ অন্যের ধর্ম্ম মিথ্যা এই কথা কখনও বলিতে পারেন না। তাই হিন্দুর মত পরমত-সহন-শীল অন্যেরা নহেন। কার্লাইল বলিয়াছেন, "যে ধর্ম্মে দর্শন-জ্ঞানের সহিত ধর্ম্মবিশ্বাসের সমন্বয় সাধিত হইয়াছে এবং যে ধর্ম্মের আচার্য্যগণ দার্শনিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ, সেই ধর্ম্মের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, কেননা সত্যের সহিত সেই ধর্ম্ম সমন্বিত হইতে পারিবে।"

ঋষিগণ "ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি" বলিয়া উপনিষৎ আরম্ভ করেন, অর্থাৎ ব্রহ্মবাদিগণ এই কথাগুলি বলিয়াছেন। প্রত্যেক সাধককেই ব্রহ্মবাদী হইতে হইবে এবং সত্যগুলি যাচাই করিয়া তাহাদের সত্যতা-অসত্যতা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। বাস্তবিক পক্ষে, বিশ্বাসিগণের জীবন-চরিত অধ্যয়ন করিলে দেখিতে পাই যে তাঁহারা সকলেই সাধনা-দ্বারা সত্য লাভ করিয়াছেন। এদেশে conformityতে এত জোর দেওয়া হয় নাই, যদিও সমাজ-প্রতিষ্ঠার জন্য গার্হস্থ্য-জীবনে কতকগুলি সামাজিক ব্যবস্থা সকলকেই পালন করিতে হয় এবং এইগুলি ঋষিগণ এমন ভাবে স্মৃতিতে প্রণয়ন করিয়াছেন যে তাহাতে সমাজ এতদিন রক্ষা পাইয়াছে। প্রয়োজনমত এখন এইগুলির পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা ঘটিতেছে এবং ভবিষ্যতে আরো ঘটিবে। দশ বারো হাজার বৎসর হইবে আমাদের সভ্যতার বয়স, কিন্তু আশা করি এই সভ্যতা আরো লক্ষাধিক বৎসর স্থায়ী হইবে, কাজেই সামাজিক পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। জাতিভেদ প্রভৃতি প্রাচীন ব্যবস্থা অনুসারে চলিবে না, যদিও অন্য নানা প্রকারের ভেদ মানুষের মধ্যে বিহিত হইবেই। নানা প্রকারের ভেদ না গড়িলে সভ্যতার উন্নতি-লাভ ঘটে না, কৃষ্টি দাঁড় করান যায় না। কাজেই সাম্যবাদ স্বীকৃত হইলেও ভেদবাদ অবলম্বন করিতেই হইবে। আশ্রম-বিভাগ করিয়া এদেশে ধর্ম্মের মূল সাধনায় যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে সমাজের স্থিতি ও গতি উভয় দিকই রক্ষা পাইয়াছে। সমাজকে স্থিতিশীলতা দান করিয়া গতিশীল করা হইয়াছে। "বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ, নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্" এই ভাবে ভিন্ন মতের সত্যতা স্বীকারপূর্ব্বক বলা হইল, "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্" অর্থাৎ ধর্ম্মের মূল তত্ত্বসাধকের হৃদয়ে প্রকাশিত হয় এবং তজ্জন্য উপযুক্ত শ্রেষ্ঠ আচার্য্যের নিকট উপদেশ গ্রহণ কর:— "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত", শ্রেষ্ঠ আচার্য্যের উপদেশ-গ্রহণে অনেক সময়ে সত্য বুঝা যায়। অন্য সকল বিদ্যার ন্যায় ব্রহ্মবিদ্যা-সম্বন্ধেও উপদেশের প্রয়োজন রহিয়াছে। গুরুর প্রতি যে শ্রদ্ধা এদেশে দেখা যায় তাহা অনুকরণীয়। আচার্য্যগণ সর্ব্বদাই উপদেশ দেবার জন্য উন্মুখ ছিলেন এবং উপদেশ-দান কর্ত্তব্যকার্য্য মনে করিতেন। তাঁহারা উপদেশ দেবার জন্য দেশবিদেশে ঘুরিতেন না, কেননা তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন যে তত্ত্বান্বেষিগণের প্রয়োজন-মত তাঁহারা আসিবেন। বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণ এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া তিব্বত, চীন, সিংহল, ম্যাসিডন্, শিরিয়া প্রভৃতি দেশে গিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা প্রথম মহারাজ অশোকের প্রেরণাতে গিয়াছিলেন এবং অনেক স্থলেই তত্তদ্দেশবাসিগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রচারে নীতি ও ধর্ম্মপ্রচারই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, অন্য কোনো স্বার্থের পূতিগন্ধ তাঁহাদের কার্য্যে ছিল না। তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রচারের রীতি আজও অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে; তাহাতে জগতের উপকার হইবে। তাঁহারা অন্য ধর্ম্ম মিথ্যা কখনও বলেন নাই। চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের ধর্ম্ম-ব্যবস্থায় তত্তদ্দেশ-প্রচলিত ধর্ম্মের আচরণ আজও চলিতেছে। বৌদ্ধেরা যে অহিংসা ও মানব-প্রেম সাধন ও প্রচার করিতেন, তাহা প্রচারের প্রয়োজন এখনও

আছে। বাস্তবিক পক্ষে এইরূপ অহিংস মনোবৃত্তির অভাববশতঃই আজ মানব-সভ্যতা ধ্বংসের দিকে চলিয়াছে। ভোগপ্রবণ ইউরোপীয়েরা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া সেই জ্ঞান-দ্বারা মানব-সমাজকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতেছেন এবং মানুষকে পশুত্বে অবনমিত করিতেছেন। ভারতীয় সাধনার মূলতত্ত্ব অহিংসা ও সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান-সাধন ব্যতীত মানব-সমাজ রক্ষা হইবে, মনে হয় না।

এখন ভক্তি-সাধন-সম্বন্ধে কিছু বলিয়া আমি এই প্রবন্ধ শেষ করিব। বৈদান্তিক প্রণালীতে বা তান্ত্রিক প্রণালীতে জ্ঞান-সাধনা সাধারণ বিষয়ী লোকের পক্ষে সকল সময়েই কঠিন ছিল, তজ্জন্য জ্ঞান-সাধনা একটা শ্রেণী-বিশেষের কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত। গার্হস্থ্য জীবনও কর্ম্ম-ভক্তি-সাধনার ক্ষেত্র। তজ্জন্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান পরিত্যক্ত হয় নাই এবং সমাজ-রক্ষার জন্য কর্ম্মের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। গীতা পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিয়াছেন। ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের গ্লানির কারণ কর্ম্মত্যাগ বলিয়া মনে হয়। বৌদ্ধেরা বৈদিক কর্ম্ম ত্যাগ করিলেন; কেননা যজ্ঞাদিতে কর্ম্ম-বাহুল্য এবং তাহাতে চরিত্র-গঠন-বিষয়ে অমনোযোগ দেখা যাইত। মানুষের ও জীবের প্রতি অত্যাচারও হইত। বুদ্ধদেব তজ্জন্য নৈতিক জীবনের প্রাধান্য প্রচার করিলেন। মাতাপিতার প্রতি ভক্তি, অন্যের উপর প্রভুত্ব-লাভের জন্য চেষ্টা না করিয়া নিজের রিপু জয় করিয়া কামনা বর্জন করা, অন্যকে প্রেমের সহিত দেখা, হিংসার ভাব পরিত্যাগ করা, ইত্যাদি রূপ নীতি তাঁহারা প্রচার করিলেন। সকলের প্রতি সমদৃষ্টি এইরূপ সন্নীতি লোকের মনকে সর্ব্বদাই আকর্ষণ করে। তাঁহারা লোকের হিতসাধনের জন্য নানা প্রকারের কার্য্যও করিতেন। এমন কি পশুর জন্য হাসপাতাল-নির্ম্মাণ তাঁহারাই সর্ব্বপ্রথমে করেন। আজও আমাদের রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মিশন যেভাবে লোকশ্রেয়ঃ সাধন করিতেছেন, তাহাতে মনে হয় যে কালে এইরূপ লোকশ্রেয়ঃ-সাধনে বা "সর্ব্বভূতহিতে রত" লোকের ধর্ম্মই মানবের ধর্ম্ম হইয়া উঠিতে পারে। অশোকের ন্যায় পৃষ্ঠপোষক লোক যদি এই ভাবে পৃথিবীর সর্ব্বত্র হিতসাধনে প্রয়াস করেন, তিনি এই প্রকারের লোকশ্রেয়ঃ-সাধনকে ধর্ম্মের স্থানীয় করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি শুধু কর্ম্মের ধর্ম্ম মানব-আত্মার পক্ষে যথেষ্ট নহে। কাজেই বুদ্ধদেব স্বয়ং ঈশ্বর হইয়া ব্রহ্মদেশ, চীন প্রভৃতি স্থানে ভক্তির অর্ঘ্য লাভ করিতেছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি কালে হয়ত সকল দেশেই শাসন-কর্ত্তারাই লোকশ্রেয়ঃ এমন সুনিপুণভাবে সাধন করিবেন যে তাঁহারা ভবিষ্যতে অশোকের সাহায্য-গ্রহণে রাজি হইবেন না। সর্ব্বত্রই লোকেরা আত্মনির্ভরশীল হইতে চায় এবং হইতেছে। কাজেই লোকহিতসাধনের ধর্ম্ম চিরস্থায়ী হইবে মনে হয় না। মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর কি হইবে এই তত্ত্ব মানবমনকে সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত করিবে। নচিকেতা অভাবের তাড়নায় যমের শরণাপন্ন হয়েন নাই। "শস্য ইব মর্ত্ত্যঃ পচ্যতে শস্য ইব জায়তে পুনঃ," "ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ" এই দুই কথা বলিয়া তিনি যমপ্রদত্ত ঐশ্বর্য্যকে অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। আমাদের "কোথা হইতে আসিলাম, কোথা ভেসে যাই", ইত্যাদি প্রশ্নের জবাব চাই। ঘরে ঘরেই মৃত্যুর করাল ছায়া দেখা যাইতেছে। কাজেই কর্ম্ম-দ্বারা এই ভয়ের মীমাংসা হয় না। জ্ঞান-দ্বারা কেহ কেহ এই মীমাংসা করিতে পারেন, কিন্তু অধিকাংশ লোক জ্ঞানের এই ভূমি লাভ করিতে সমর্থ নহে, সুতরাং তাহাদিগকে অন্য পথ দেখাইতে হইবে।

আজ যে বহু ধর্ম্ম মানব-সমাজে প্রবর্ত্তিত দেখিতেছি তাহা সবই বিশ্বাস ও ভক্তির ধর্ম্ম—ইসলাম ধর্ম্ম, খৃষ্টান ধর্ম্ম, এদেশে প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্ম, শিখ ধর্ম্ম, ব্রাহ্ম ধর্ম্ম, তান্ত্রিক ধর্ম্ম, বৈষ্ণব ধর্ম্ম ইত্যাদি সকল ধর্ম্মেই ঈশ্বরে বিশ্বাস ও তাঁহার সাধনার জন্য নানা প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। হিন্দু ধর্ম্মে যে উদার ভাব প্রাচীন সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে,

তাহা দ্বারাই নানা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইতেছে, যদিও সকল সম্প্রদায়েরই মূলতত্ব এক। নানা প্রকারের দেব-দেবীর পূজা বা নানা অবতারের পূজা প্রবর্ত্তিত থাকিলেও সকলেই কতকগুলি নীতির আবশ্যকতা স্বীকার করেন এবং গার্হস্থ্য-জীবনের কর্ত্তব্য-সম্বন্ধেও সকলেই, একমত পোষণ করেন। বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষা-দ্বারা সকলেই এক ছাঁচে গঠিত হইতেছি এবং জীবনের উদ্দেশ্যও সকলেরই এক হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি সর্ব্বত্রই মানুষ যেন এক-পরিবারভুক্ত হইতে চাহিতেছে। মানব-সভ্যতার গতি একদিকে। যতই কেন আমরা জোরের সহিত বলি না কেন যে হিন্দু-কৃষ্টি, মুসলমান-কৃষ্টি ইত্যাদি ভিন্ন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা এক কৃষ্টিই সাধন করিতেছি। মানব-জাতি ভবিষ্যতে যে এক কৃষ্টি লাভ করিবে, তাহার সূচনা হইয়াছে বিগত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে। ফরাসী বিপ্লবেই সকল মানুষকে স্বাধীনতা দিবার বার্ত্তা ঘোষিত হয়। অবশ্য ভারতবর্ষের ঋষিগণ অনেক কথা সমগ্র মানব-জাতির জন্যই বলিয়াছিলেন এবং বোধ হয় মানব-জাতি তাঁহাদের "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ" বলিয়া যে আহ্বান তাহা শুনিবে, এবং রবীন্দ্রনাথের আহ্বান শুনিয়াছে মনে হয়। তাই আশা করি যে ভক্তির সাধনা বৃহদারণ্যকে দেখি, সেই সাধনাই একদিন প্রকৃত ভক্তি-সাধনা বলিয়া জগতে গৃহীত হইবে, কেননা "সনো বন্ধুর্জনিতা সখেতি" তিনি আমাদের পিতা, বন্ধু ও সখা। তিনি এক জন ব্যক্তি বা পুরুষ। "তং বেদ্যং পুরুষং বেদ", বলিয়া ঋষি উপদেশ দিলেন—এই ব্যক্তিত্বই মানবের ভক্তির সহায় এবং তিনি প্রতি হৃদয়ে বর্ত্তমান। ঈশ্বরের এই ব্যক্তিত্বকে অবলম্বন করিয়াই অবতার-বাদ ও দেব-বাদ ইত্যাদি গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাতে ভক্তি-সাধনায় জ্ঞানের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে।

ভক্তিসম্বন্ধে ভাগবত বলিতেছেন :

"তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া ॥"

অর্থাৎ কেবল সাধনরূপা ভক্তিদ্বারা ভগবৎ-সাক্ষাৎকার-লাভ হয় না। তবে জ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্তা পরমাভক্তি-দ্বারা তাহা লাভ হয়, তাহা নির্দ্দেশ করিতেছেন—

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

"শ্রদ্ধান্বিত মুনিগণ বেদান্ত শ্রবণ-দ্বারা গৃহীত এবং জ্ঞানবৈরাগ্য-দ্বারা পরিপুষ্ট ভক্তিযোগে স্বীয় বিশুদ্ধ আত্মাতে (ক্ষেত্রজ্ঞে) পরমাত্মাকে দর্শন করেন।"

তত্ত্ব বলিতে ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ এই ত্রিবিধ নামে যিনি অভিহিত, তাঁহাকে বুঝায়। ভক্তবৎসলে ভক্তদিগকে দর্শন করা পারমহংস্য ধর্ম্মের বিশেষ লক্ষণ। যে হৃদয় ভগবৎ-সাক্ষাৎকারে কৃতকৃতার্থ, তাহা ঋষি, মহর্ষি, মহাজনগণ এবং ভক্তদিগের আবাস-স্থান। ইহা দ্বারা যাঁহার ভগবানে অকিঞ্চন ভক্তি আছে তাঁহাতে দেবগণ সমুদয় গুণ সহকারে অবস্থিতি করেন, ইহা উদ্ভাসিত হইতেছে।—উপাধ্যায়।

এইরূপ ভক্তিসাধনায় বিজ্ঞান বা দর্শনজ্ঞান বাধা জন্মাইতে পারে না। এ দেশে ভক্তি-সাধনা সহজ করার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। তাহাতে নানা দোষও সমাজে সংক্রামিত দেখা যায়। প্রকৃত বিশ্বাসীর পক্ষে এই সকল দোষ দোষাবহ নাও হইতে পারে। এদেশের মূর্ত্তিপূজা কিন্তু গ্রীস্, রোম বা বাবিলনীয় মূর্ত্তিপূজার ন্যায় নহে। এদেশে বৈদিক দেবতাগণের মূর্ত্তি ছিল না ; তাঁহারা ছিলেন প্রত্যক্ষভাবে দৃষ্ট দেবতা। পুরাণাদিতে যে সকল দেবতা পূজিত হইতেছেন, তাঁহারা কতকটা রূপক মাত্র, একেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপকল্পনা মাত্র,

শাস্ত্র বলিতেছেন। গ্রীক বা রোমকদিগের দেবতাগণ এই ভাবের রূপক নহেন; একের অনুভূতিও গ্রীসে বা রোমে এই ভাবে পরিষ্কার নহে। "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি", এই তত্ত্ব গ্রীসে বা বাবিলনে ধৃত হয় নাই। যাঁহারা শিবলিঙ্গ বা শালগ্রাম পূজা করেন, তাঁহারা যে symbol বা প্রতীক পূজা করেন, তাহা জানেন। এদেশের গুরুবাদেও বাইবেল বা কোরাণ-বর্ণিত prophetism দেখিলে ভুল করা হইবে। গুরুবাদ আচার্য্যবাদ-প্রসূত। আচার্য্য আমরা আজও স্বীকার করি, যদিও আচার্য্যবাদের অতিমাত্রা অর্থাৎ গুরুবাদ সকলে স্বীকার করি না। একমাত্র এদেশের গুরুগণ prophet নহেন। তাঁহারা জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত করেন, কোন্ পথে যাইতে হইবে বলিয়া দেন, কিন্তু যিশুর ন্যায় ত্রাণকর্ত্তা নহেন। তাঁহারাও পাপভার লাঘব করিতে পারেন, কিন্তু যিশুর দাবীর ন্যায় দাবী তাঁহারা করেন না। মহম্মদের ন্যায় ধর্ম্মের একমাত্র পথ-প্রদর্শক বলিয়া তাঁহারা অন্য শিক্ষককে অগ্রাহ্য করেন না। বিশ্বের সঙ্গে বা ঈশ্বরের সঙ্গে যোগের ভাবও এদেশে পৃথক্। একাত্মতা-সাধন এদেশের একটী মহৎ ভাব, তাহাতে হিংস্রজন্তুর সঙ্গেও মৈত্রী সাধিত হয়। এক্ সাধুকে কালসর্প দংশন করিলে পর, তিনি তিনদিন অজ্ঞান ছিলেন; পরে চৈতন্য লাভ করিয়া বলিলেন, "বাসুকীজি প্রেম কিয়া।" এদেশের ভক্তেরা এই ভাবেই প্রেম সাধন করেন।

উপনিষদের তত্ত্বই ভক্তি-শাস্ত্রে গৃহীত মনে হয়। বৃহদারণ্যকে বলা হইতেছে:

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

ঐ ব্রহ্ম পূর্ণ, এই ব্রহ্ম পূর্ণ। ঐ এবং এই পূর্ণব্রহ্ম হইতে পূর্ণব্রহ্মই উদ্গত হন। ঐ এবং এই পূর্ণব্রহ্ম হইতে ঐ পূর্ণব্রহ্মকে আদান করিলে যিনি অবশেষ থাকেন তিনি পূর্ণব্রহ্মই।

ঐ শব্দে দূরস্থ বুঝায়, সুতরাং ঐ শব্দে সর্ব্বাতীত যিনি। এই শব্দে নিকটস্থ বুঝায়, এই ব্রহ্ম হৃদয়স্থ ব্রহ্ম পরমাত্মা। ঐ দূরস্থ ব্রহ্ম এবং এই নিকটস্থ ব্রহ্ম এই দুইএর সম্মিলনে পূর্ণব্রহ্ম—ভগবান্। দূরস্থ জগৎ এবং নিকটস্থ আত্মা। যুগপৎ জগৎ ও আত্মায় অনুভূত ব্রহ্ম ভগবান্, কেননা জগৎ ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য। ঐশ্বর্য্যসহ যিনি আত্মায় সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে উপলব্ধির বিষয় হন, তিনি ঐশ্বর্য্যবান্ ঈশ্বর। জগৎ বলিতে দৃশ্যাদৃশ্য নিখিল জগৎ বুঝায়। অদৃশ্য জগৎ আমাদের বুদ্ধির অতীত। ব্রহ্মকে অন্তরে না দেখিয়া বাহিরে দেখিতে গেলে আমাদের বুদ্ধির অতীত বাহিরের জগৎ আসিয়া মনে উপস্থিত হয় এবং সেইখানেই মন বিশ্রামলাভ করে না; অতীতের পর পর অতীত, জ্ঞানে প্রতিভাত হইয়া সর্ব্বাতীতত্ব হৃদয়ে মুদ্রিত হয়। যিনি সর্ব্বাতীত, তিনিই আবার সর্ব্বগত হইয়া হৃদয়ে ও জগতে বিরাজিত এবং তিনিই ভগবান্ বা সর্ব্বান্তর্ভাবক-রূপে প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ে প্রত্যক্ বা স্বপ্রকাশ হইয়া রহিয়াছেন। এই যে সর্ব্বাতীত, সর্ব্বগত ও সর্ব্বান্তভাবক ভাবে যিনি উপলব্ধ হইলেন, তিনি প্রকৃত পক্ষে অদ্বয় জ্ঞানবস্তু। তাই ভাগবতে বলা হইয়াছে—

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

অর্থাৎ এক অদ্বয় জ্ঞানরূপে প্রকাশিত, তিনিই সর্ব্বাতীত ব্রহ্ম এবং সর্ব্বগত পরমাত্মা এবং সর্ব্বান্তর্ভাবক ভগবান্ এবং জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম দ্বারা তিনভাবে তাঁহাকে লাভ করিতে হইবে। তাই ভাগবত পুনরায় বলিতেছেন:

জ্ঞানমাত্রং পরং ব্রহ্ম পরমাত্মেশ্বরঃ পুমান্।
দৃশ্যাদিভিঃ পৃথগ্ ভাবৈর্ভগবানেক ঈয়তে॥

অর্থাৎ ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই ত্রিবিধ শব্দে অভিহিত সেই অদ্বয় জ্ঞান চিন্তার প্রকারভেদে ত্রিবিধরূপে গৃহীত হইলেও উহার একত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। সাধকগণের দর্শনের প্রকার-ভেদে এক অদ্বয় জ্ঞানবস্তু জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি অনুসারে পরব্রহ্ম, প্রেরয়িতা পরমাত্মা ঈশ্বর এবং পরমপুরুষ ভগবান্ এই ত্রিবিধভাবে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। তিনি এক সময়েই সর্ব্বাতীত ব্রহ্ম, সর্ব্বগত পরমাত্মা ও সর্ব্বান্তর্ভাবক ভগবান্। জ্ঞানে তাঁহাকে ব্রহ্মরূপে, কর্ম্মদ্বারা প্রেরয়িতা পরমেশ্বররূপে এবং ভক্তিতে পরমপুরুষ ভগবান্-রূপে সাধকেরা আরাধনা করেন। —উপাধ্যায়।

সংক্ষেপে এই যে ব্রহ্মের তিন অবস্থার কথা বলা হইল তাহার সহিত যদি Christian ত্রিত্ববাদের তুলনা করা যায়, তাহা হইলে এইরূপ দাঁড়ায়—God the Father হইলেন সর্ব্বাতীত, Holy Ghost যিনি সকলের আত্মাতে রহিয়াছেন (Know ye not that yeare the Temple of the Holy ghost.—St. Paul) এবং God the Son সর্ব্বগত বা ঐশ্বর্য্যময় ঈশ্বর, যিনি পাপীর উদ্ধারের জন্য Maryর গর্ভে জন্মিলেন। Philo প্রথম ঈশ্বরের যে ঐশ্বর্য্য সৃষ্টিতে বিদ্যমান, সেই জ্ঞান বা wisdomকে ব্যক্তিত্ব দান করিয়া মত খাড়া করেন। St. Paul এবং St. John এই ব্যক্তিত্বকে যিশুতে আরোপ করিয়া তাঁহাকে ঈশ্বরের পুত্ররূপে গ্রহণের জন্য মানবজাতির নিকট উপস্থিত করেন। এই পুত্রত্ব ত প্রত্যেক মানবে বর্ত্তমান, কেননা প্রতি হৃদয়েই তিনি পিতা। "পিতা নোঽসি" বলিয়া আমাদের ঋষি ঈশ্বরকে আহ্বান করিয়াছেন। সকল মানবের পুত্রত্ব লাভ করিতে হইবে, যিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হইতে হইবে এবং পিতার উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য সর্ব্বত্যাগী হইয়া দুঃখ বহন করার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। এই ভক্তিমার্গই নানাভাবে সাধিত হয়। মুসলমানগণ প্রভু পরমেশ্বর, খৃষ্টান সাধক Pater noster, হিন্দু পিতা বা মাতা অথবা প্রাণপতি ইত্যাদি ভাবে গদ্‌গদ হইয়া প্রণতি করেন। "ষোল আনা প্রেম না দিলে তাঁহার মন ওঠে না।"

---

(৪) নৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি

হিন্দুদের নীতিশাস্ত্রের তেমন উন্নতি হয় নাই, একজন জার্ম্মান পণ্ডিত কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই আপত্তি করিলে স্বর্গগত অধ্যাপক উইন্‌টারনিজ তাঁহার এক জবাব "প্রবুদ্ধ ভারতে" প্রকাশ করেন এবং আমি তাহার পোষক এক প্রবন্ধে হিন্দুদের নৈতিক আদর্শ যে ইউরোপীয় আদর্শ হইতে একটু ভিন্ন রকমের তাহা দেখাইবার চেষ্টা করি। মান্দ্রাজবাসী পণ্ডিত স্যার শিবস্বামী আইয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের Kamala Lectureএ "Evolution of the Hindu Ethics" দেখাইয়াছেন, কিন্তু তিনিও হিন্দু Ethics তেমন বিচার-সহ নহে এবং এই নৈতিক বিজ্ঞানে হিন্দুরা কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই, এই ভাবের কথাই বলিয়াছেন এবং মনু প্রভৃতি স্মৃতি গ্রন্থ হইতেই শ্লোকসমহ উদ্ধার করিয়া হিন্দুদের নীতিশাস্ত্রের নানা আদর্শের বিচার করিয়াছেন। রাজার আদশ, স্ত্রীধর্ম্ম, শূদ্রদের ধর্ম্ম ইত্যাদির বিচার তিনি করিয়াছেন, কিন্তু গীতায় যে উচ্চনীতি

ও কর্ম্মের আদর্শ দেখান হইয়াছে বা বৌদ্ধ ও জৈনদিগের মধ্যে যে সকল উচ্চ নীতির বিকাশ হইয়াছিল, সেই সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথাই বলেন নাই। তিনি বৌদ্ধ এবং জৈন শিক্ষকগণকে হিন্দুত্বের গণ্ডীর বাহিরে রাখিয়া দিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর সুশীল মৈত্র মহাশয় হিন্দুদের Ethics সম্বন্ধে গবেষণাপূর্ণ এক গ্রন্থ লিখিয়াছেন, কিন্তু তাহা সর্ব্ব-সাধারণের পাঠোপযোগী হয় নাই বলিয়াই মনে হয়, জানিনা তাহা কোথাও কোন পরীক্ষায় ছাত্রগণের পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে কিনা। আমাদের ছাত্রগণ যে Ethics বি.এ. বা এম.এ. পরীক্ষার জন্য পাঠ করেন তাহাতে হিন্দু Ethics এর স্থান নাই, হিন্দু Psychology-রও স্থান নাই, যদিও আমি মনে করি Ethics এবং Psychology-সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত-গুলি European সিদ্ধান্ত অপেক্ষা অনেক গভীর জ্ঞান দিতে পারে এবং এই গভীরতাই হিন্দু সভ্যতা ও সাধনাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। হিন্দু উচ্চতর নীতির অনুবর্ত্তন করিয়াই সংযত ও সহনশীল হইয়াছেন এবং মনস্তত্ত্বের বিচার করিয়াই ধর্ম্ম-সাধনায় গভীরতা লাভ করিয়াছেন। আমাদের শৈশবের শিক্ষা আরম্ভ হয় চাণক্যের নীতিশিক্ষা-দ্বারা এবং মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণ, সাহিত্য, স্মৃতি সবই নীতিকথাতে পূর্ণ।

ইউরোপের Wisdom Literatureও পূর্ব্বদেশ হইতে প্রাপ্ত। Sermon on the Mount এর নীতিতেও পূর্ব্বদেশীয় প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। পারস্য দেশের নীতিবাদের Herodotus প্রশংসা করিয়াছেন এবং Evil এবং Goodএর পরিষ্কার ধারণা পারস্য হইতেই পশ্চিমে গিয়া ইহুদী প্রভৃতি জাতির নীতি উন্নত করিয়াছে। মিশরীয় সভ্যতাতে ভারতীয় প্রভাবের ছাপ রহিয়াছে এবং মিশরীয় শিক্ষাদীক্ষা গ্রীসেও প্রসার লাভ করিয়াছিল। চীন ও ভারতবর্ষেই অনেক নীতির আবিষ্কার হইয়াছিল। মনু বলিয়াছেন—

এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ ॥

এই কথা দম্ভপ্রসূত নহে। হিন্দুদের আচার ও জীবনযাপন-প্রণালী মিতব্যয়িতা এবং স্বাস্থ্যের অনুকূল। বোধ হয় ধর্ম্মসাধনার পক্ষেও তাঁহাদের আহার-বিহারের নিয়ম অন্যের নিকট গ্রহণীয়। "আচারাল্লভতে আয়ুঃ"—হিন্দু আচার ও সংযত জীবনযাপনের রীতি চিন্তাশীল লোকের পক্ষে অনুকরণীয়। এই দেশের নীতিই বৌদ্ধগণের দ্বারা পৃথিবীময় প্রচারিত হইয়া মানব-সমাজের নীতিকে উন্নত করিয়া দিয়াছে। আমি ত মনে করি আজও যদি হিন্দু তাঁহার স্বকীয় নীতি অবলম্বন করিয়া বিশ্বমৈত্রী সাধন করিতে পারেন, তবে মহত্বলাভ করিয়া মহাত্মা গান্ধী যে accident নন, পরন্তু হিন্দুর রক্তের ফল, তাহা প্রমাণ করিতে পারিবেন।

নীতি ত মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারের জন্য আবশ্যক হয়। পৃথিবীতে যদি এক জন মানুষ থাকিত, তাহা হইলে নীতির প্রয়োজন হইত না। কিন্তু দুই জন মানুষ জন্মিলেই নীতির প্রয়োজন হয়। তাহাদের মধ্যে হয় বৈরভাব, না হয় বন্ধুভাব অবলম্বন করিতে হইবে। কাজেই ঋগ্বেদের সময়েই নীতিশিক্ষা আরম্ভ হয় এবং সভ্য বা তথাকথিত অসভ্য-সমাজে সর্ব্বত্রই কতকগুলি নীতিপ্রবর্ত্তিত হয়, কেননা মানুষ সামাজিক জীব, এবং সমাজে বাস করা নীতিবিহীন লোকের পক্ষে সম্ভব নয়, জীবনের সহিত অন্বিত হইয়াই নীতি প্রবর্ত্তিত হয়। আমি এদেশবাসীর জীবনে যে নীতি লক্ষ্য করিয়াছি, তাহার কথাই বলিব, মীমাংসক এবং নৈয়ায়িকগণ যে সব সূক্ষ্মতত্ত্বের বিচার করিয়াছেন তাহাতে প্রবেশ করিব না। গ্রাম্য নরনারীকে যে নীতি পালন করিতে দেখিয়াছি, অশিক্ষিত-শ্রেণীস্থ লোকের নিকট যে সব কথা শুনিয়াছি, তাহাই বলিবার চেষ্টা করিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ইউরোপায় সভ্যতা দেহাত্মবাদী,

এবং দেহ-সম্বন্ধেই তাঁহাদের চিন্তা অধিক ক্রিয়াশীল ; আমাদের সভ্যতা আত্মিক মঙ্গলের দিকে অধিক গতিশীল ; সুতরাং এদেশের নীতিতে ত্যাগ ও আত্মসংযমই অধিক বরণীয়। Self sacrifice এবং self-suppression আমাদের দেশে অধিক বরণীয় হইয়া রহিয়াছে, self-expansion এবং self-assertion তত বরণীয় হইতে পারে নাই। তজ্জন্য স্ত্রী স্বামীর অনুগামিনী, পুত্র পিতার অনুগত, ইত্যাদি। এদেশের ব্যক্তিত্ব যে ইউরোপীয় ব্যক্তিত্ব অপেক্ষা ভিন্ন রকমের, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এদেশীয় সভ্যতায় সেবা ও আত্মত্যাগই আদর্শ। এখনও এই আদর্শ দ্বারাই আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত।

আমি অনেক সময়ে রামায়ণ ও 'King Lear'এর তুলনা করি। এই দুই মহান্ গ্রন্থে পারিবারিক জীবনের এক একটা আদর্শ প্রস্ফুটিত দেখা যায়। King Learএ দেখান হইল যে পিতা ও সন্তানের সম্বন্ধ যদি স্বার্থপরতা-দুষ্ট হয়, তাহা হইলে পারিবারিক জীবন বিষাক্ত হয়। এই প্রকার সম্বন্ধ পিতা ও কন্যাগণের মধ্যে এদেশে বড় দেখা যায় না। রামায়ণে দেখা যায় পুত্রশোকে পিতার মৃত্যু ; রামচন্দ্র আদর্শ পুত্র, সীতা আদর্শ নারী, লক্ষ্মণ আদর্শ ভ্রাতা। আজও হিন্দু পরিবারে এই আদর্শগুলি বজায় রাখার চেষ্টা হয়। রাম আদর্শ রাজা, যিনি প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা ভার্য্যাকে নির্দ্দোষ জানিয়াও প্রজারঞ্জনের জন্য নির্ব্বাসিত করিতে পারেন এবং তাঁহার স্বর্ণপ্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হন। 'King Lear' এবং রামায়ণ দুইটী পারিবারিক চিত্রে দুই সভ্যতার বৈশিষ্ট্য বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমার শ্রীহট্ট-নিবাসী ভৃত্যকে, সে কেন বাড়ী গিয়াছিল জিজ্ঞাসা করাতে উত্তর পাইয়াছিলাম, সে ভ্রাতাকে বিবাহ করাইতে বাড়ী গিয়াছিল। আমি ভাবিয়া দেখিলাম যে তাহারা পরিবারের স্থিতির জন্য ভাইকে বিবাহ করান কর্ত্তব্য মনে করে, এবং এই ভাব হইতেই এখনও এদেশে পারিবারিক জীবন সুখকর হইয়া রহিয়াছে এবং সভ্যতা স্থায়িত্বলাভ করিয়াছে। এদেশের লোকেরা স্থায়িত্ব চায়, "যাবৎ চন্দ্র-দিবাকরৌ" থাকিতে চায়, এবং তজ্জন্য সেই ভাবে জীবন-পথে চলে। পারিবারিক জীবনের দৃঢ়তা-দ্বারা ব্যক্তিত্ব ব্যাহত হয় সত্য, দেশের জন্য লোকেরা ত্যাগ-স্বীকারে পরাঙ্মুখ থাকে, কিন্তু তথাপি স্থায়িত্বের পক্ষে এইরূপ সুদৃঢ় পারিবারিক জীবন অনুকূল। Aristotle এক স্থানে বলিয়াছেন যে, শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থাপক Absolute justice অপেক্ষা স্থায়িত্বের দিকে অধিক লক্ষ্য রাখেন। Absolute virtue অবশ্য বিশেষ মঙ্গলের জন্য আত্মবিসর্জ্জন, কিন্তু যিনি সকল মানুষের জন্য আত্মবিসর্জ্জন দিতে পারেন না, তিনি যদি পরিবারের জন্য আত্মত্যাগ করিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন তাহা হইলে পরে হয়ত বিশ্বপ্রেমে পাগল হইতে পারিবেন।

এদেশে বিবাহটা ভোগের জন্য নহে, কেননা বিবাহ পরিবারের স্থিতি এবং পিতৃলোকের প্রতি কর্ত্তব্যসাধন। "সন্তত্যা পিতৃলোকানাম্", অর্থাৎ সন্তানোৎপাদনও একটা ধর্ম্মকার্য্য। জাতির সংখ্যা বাড়াইয়া প্রতিদ্বন্দ্বী জাতিকে পরাভূত করার ইচ্ছা অপেক্ষা এই আদর্শ অনেক গুণে উচ্চ। এখন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে সংখ্যাবৃদ্ধি করার যে পাশবিক ভাব দেখা দিয়াছে, ইহাতে উভয়ের আদর্শই পশুত্বের দিকে অগ্রসর হইবে। মুসলমানের আদর্শ ছিল আল্লার নাম করার জন্য লোক-বৃদ্ধির প্রয়োজন, কিন্তু এখন অন্য উদ্দেশ্যই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের গতিও এখন অধোদিকে।

অনেক ইউরোপীয় লেখকের এবং আমাদের মধ্যেও অনেকের বিশ্বাস যে আমাদের মধ্যে ব্যক্তিত্ব নিতান্ত দুর্ব্বল এবং তজ্জন্য নীতিবিষয়ে আমরা হীন ; আমরা গুরু, শাস্ত্র ও অভিভাবকের অধীন বলিয়া আমরা স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া চলিতে পারি না, ইহাই অনেকের অভিমত। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমি এই মতে সায় দিই না। কেননা "আপদঃ কথিতঃ

পন্থা ইন্দ্রিয়াণামসংযমঃ, তজ্জয়ঃ সম্পদাং মার্গো যেনেষ্টং তেন গম্যতাম্'', এই শ্লোকে ব্যক্তির যে ইন্দ্রিয়-সংযমে শক্তি আছে, তাহা স্বীকার করা হইয়াছে এবং স্বাধীনতা-দ্বারা এই আত্মসংযম সাধন করিতে হইবে, ব্যক্তির ইচ্ছানুসারে সে যে পথে ইচ্ছা চলিবে। স্বাধীনতা ত আত্মিক উন্নতির জন্য, যথেচ্ছাচারী হইয়া উচ্ছৃঙ্খল হওয়ার জন্য নহে। এদেশের সব শাস্ত্রেই ত ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ে ব্যক্তির যথেষ্ট স্বাধীনতা স্বীকার করা হইয়াছে। ব্যক্তির পাপপুণ্যের জন্য ব্যক্তি দায়ী এবং নীতিসম্বন্ধে সর্ব্বদাই বিধিলিঙ্ প্রয়োগ করিয়া ব্যক্তিকে পথ দেখান হইয়াছে মাত্র, "Thou shalt not, shalt not" বলিয়া ভীতিপ্রদর্শন করা হয় নাই। আশ্রমের কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আশ্রমবিভাগ-দ্বারা সমাজে গতি ও স্থিতি উভয়েরই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এদেশের সমাজে ও পরিবারে সেবার আদর্শই সাধনা করা হয়, তজ্জন্য সমাজে ও পরিবারে উভয় এ শান্তি বিরাজ করিতেছে। Divorce হয় ত এখন আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, কেননা বৈদেশিক শাসন ও ব্যবস্থার প্রভাবে এখন লোকের জীবনের আদর্শ অন্য রকম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাজেই কেহ কেহ এখন বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করার প্রয়োজন বোধ করিতেছেন, কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র মানিলে এই বন্ধন অনন্তকাল স্থায়ী বলিয়া ইহার ছেদন হইতে পারে না। তবে কর্ম্মবাদে বিশ্বাস উঠিয়া যাইতেছে বলিয়া, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আদর্শকে কেহ কেহ বরণ করিতেছেন।

হিন্দু নীতির ভিত্তি কর্ম্মবাদ ও ভাগ্যবাদ। পূর্ব্বেই তৃতীয় প্রবন্ধে বলিয়াছি যে হিন্দুর জন্ম accident বা আকস্মিক ঘটনা নহে, তাহার বিশ্বাস যে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মানুসারে তাহার আত্মার উন্নতির অনুকূল আবেষ্টনের মধ্যে বিধাতা তাহাকে স্থাপন করেন; সে এইরূপ পরিবার ও পিতামাতা লাভ করে, যাহাতে তাহার সঞ্চিত কর্ম্মের ফল পাইতে পারে এবং আরব্ধ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া ভবিষ্যৎ জীবনে উন্নততর অবস্থা লাভ করিতে পারে। হিন্দুর নিকট তাহার বর্ত্তমান জন্ম অতীত ও ভবিষ্যৎ জীবনের বা অনন্ত জীবনের সহিত অনুস্যূত। সে তাহার শ্রেষ্ঠতা বা নিকৃষ্টতার জন্য অন্যকে দায়ী করিতে পারে না, সে নিজের অবস্থাকে নিজ কর্ম্মের ফল মনে করে; ইহাতে তাহার মনে সমাজের প্রতি বিদ্রোহের ভাব জন্মিতে পারে না, কেননা সে অন্যকে তাহার হীনাবস্থার জন্য দায়ী মনে করে না। তাহার বিশ্বাস—সে যদি সাধুপথে চলিতে পারে, তবে সে ভবিষ্যতে উত্তম গতি লাভ করিবে। ইউরোপীয় নীতিতে কর্ম্মের ফল এত সূক্ষ্মভাবে বিচার করা হয় নাই, এই জন্মের কাজের ফল এখানেই ভোগের কথা বলা হয়, এত দূরেও যে কর্ম্মফল যাইতে পারে সে বিশ্বাস ইউরোপে বিশেষ নাই। Dante Inferno তে পাপপুণ্যের ফল দেখাইয়া মধ্যযুগের লোকদিগকে কর্ম্মের অপরিহার্য্য ফল আছে এই শিক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু আজকাল ইউরোপ Penal Code দ্বারাই শাসিত হইতেছে; অগত্যা Code of Honour নামক একটা সামাজিক রীতির অনুগামী মাত্র। Freewill-বাদী নীতি মানুষের প্রকৃতির বিচার করে না, সকলেই পাপ বা অন্যায় সমানভাবে বর্জ্জন করিতে পারে বলিয়া উৎসাহিত করে। আমরা কিন্তু জানি যে মানুষের মন জিনিষটার ভিতরে Inherent প্রাকৃতিক বা সহজও একটা স্বভাব বর্ত্তমান আছে; তাই গীতা বলেন—'প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি।' কেহ সত্ত্বপ্রধান, কেহ রজঃপ্রধান, কেহ তমোগুণান্বিত। এই ভাবে মানুষের মধ্যে মূল প্রকৃতির পার্থক্য বিদ্যমান আছে। এই-ভাবে কর্ম্ম ও গুণের বিচার ইউরোপীয় নীতিশাস্ত্রে নাই। তাঁহারা freewill সকলের পক্ষেই সমানভাবে প্রযোজ্য বলেন এবং সকলের পক্ষেই একরূপ দণ্ড-পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন। Freewill-বাদিগণের এই মত Necessitarian-বাদিগণ অস্বীকার করিয়া দেখান যে সাংসারিক অবস্থা, শিক্ষা, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন ইত্যাদি দ্বারা মানুষের চরিত্র নিয়ন্ত্রিত হয়, কাজেই অধিকারিভেদ জন্মিয়া যায়। Freewill সকলে এক ভাবে প্রয়োগ করিতে

পারে না। এই মতবিরোধ চিরস্থায়ী হইয়া রহিয়াছে। কর্ম্মবাদী নীতিশাস্ত্র বলে যে, তুমি যদিও পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল দ্বারা চালিত হইতেছ, তথাপি 'সু' এবং 'কু'র জ্ঞান তোমার আছে, 'সু'কে গ্রহণ কর, 'কু'কে বর্জন কর, তোমার মঙ্গল হইবে। এবং গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ এই 'সু' এবং 'কু'র দ্বন্দ্বের উপরে যাইতে অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—"নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন," গুণের অতীত হওয়াই সাধকের আদর্শ। পশুপক্ষীতেও সত্বগুণ সময়ে সময়ে দেখা যায়। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে Freewill-বাদী এবং কর্ম্মবাদী, উভয়েই নীতিশিক্ষার প্রয়োজন স্বীকার করেন এবং কর্ম্মবাদীও ব্যক্তির পাপ-পথ-বর্জ্জনের ক্ষমতা আছে, স্বীকার করেন। যুক্তিবাদী তাই শিক্ষা দেন—

পূর্ব্বজন্ম-কৃতং কর্ম্ম তদ্দৈবমিতি কথ্যতে।
তস্মাৎ পুরুষকারেণ যত্নং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ ॥

ইহাতে পুরুষকার ও চেষ্টা অপরিহার্য্য দেখান হইল এবং ভাগ্যবাদ দ্বারা যে ব্যক্তির পুরুষকার ব্যাহত হয়, তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে, দেখান হইল। বাস্তবিক পক্ষে সকল দেশে এবং সকল সময়েই লোক ভাগ্য বলিয়া একটা প্রবল শক্তির সত্তা স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু তথাপি মানুষ পুরুষকার অবলম্বন করিতে ক্রটী করে নাই। গ্রীকরাও destiny মানিতেন, কিন্তু কেহই নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। এদেশবাসীরাও চেষ্টা করিয়াই জীবনধারণ করিয়াছেন এবং করিতেছেন। "নহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ," তাঁহারা জানিতেন। ভাগ্যবাদ-বিশ্বাসীর জীবন-প্রবাহ ঈশ্বরের ইচ্ছায় পরিচালিত হয়, এবং বিশ্বাসী লোকেরা "লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ"কে ঈশ্বরেচ্ছার ফল বলিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করেন। ধৈর্য্য এদেশে সাধিত হইয়াছিল, তাই ইঁহারা এত প্রকারের বিপদ্ কাটাইয়া বাঁচিয়াছেন।

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ," এই এক ছত্রে গীতা কর্ম্মবাদ দ্বারাই যে জাতিভেদ নিয়ন্ত্রিত হয় তাহা বলিয়া দিলেন। কর্ম্মের বিভাগ সভ্যতার জন্য সর্ব্বত্রই আবশ্যক হইয়াছে এবং এদেশে এই বিভাগ ধর্ম্মবিশ্বাস দ্বারা সমর্থিত হওয়াতে, শ্রেণী-বিদ্বেষ এবং লড়াই বিশেষ দেখা যায় নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ইঁহাদের জীবনে স্থৈর্য্য বর্ত্তমান ছিল এবং অর্থোপার্জ্জনেও শাস্ত্রের বিধান জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া জীবনের সকল কর্ম্মকেই ধর্ম্মের প্রভাবে অনুপ্রাণিত করিত। জাতিভেদ দ্বারা ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য-ভেদ করাতে কর্ত্তব্য-সম্পাদনে কুশলতা-লাভ হইয়াছে এবং নীতির পথও পরিষ্কার হইয়াছে। নীতির সার্ব্বজনীনতা ইহাতে অস্বীকার করা হয় নাই। সত্যবাদিতা প্রভৃতি নীতি সকলের পক্ষেই পালনীয়। "যোঽনৃতম্ অভিবদতি স সমূল এব বিনশ্যতি," এইরূপ বহু নৈতিক তত্ব সকল মানুষের জন্যই নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। তথাপি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের নৈতিক আদর্শকে অতি কঠোর করিয়া মানুষের মধ্যে ভেদ যে নীতি এবং ধর্ম্মমূলক তাহা দেখান হইয়াছে। ব্রাহ্মণের আদর্শ ক্ষত্রিয়ের আদর্শ অপেক্ষা অধিক সংযমসাপেক্ষ ও ত্যাগমূলক; ক্ষত্রিয়ের আদর্শ বৈশ্যের আদর্শ অপেক্ষা অধিক কষ্টসাধ্য, এবং বৈশ্যের আদশ শূদ্রের আদশ অপেক্ষা দুরূহ। কাজেই সামাজিক শ্রেষ্ঠতা এখানে বৈপ্লবিক মনোভাব উৎপাদন করে নাই। আজকাল সামাজিক শ্রেষ্ঠতা নিম্নস্থ লোকের পক্ষে অসহ্য, কেননা উপরিস্থ লোকেরা তাহাদের শ্রেষ্ঠতাকে ভোগের জন্য (লোকসেবার জন্য নহে) ব্যবহার করিয়া নিম্নস্থ লোকের পীড়া উৎপাদন করিতেছেন। ব্রাহ্মণ যদি পূর্ব্বের ন্যায় ত্যাগী, ধার্ম্মিক এবং জ্ঞানী হইয়া সমাজের সেবা করেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণেতর জাতি তাঁহাকে অগ্রাহ্য মনে করিবে না। রাজা যদি প্রকৃতই প্রজাপালক হন এবং ভোগপরায়ণ অত্যাচারী নরাকার ব্যাঘ্র বা অন্য হিংস্র জন্তুর ন্যায় ব্যবহার না করেন, তাহা হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে

আন্দোলন কেহ করিবে না। বৈশ্যগণ যদি সমাজের উপকারার্থেই ব্যবসায় পরিচালিত করেন এবং যাহাতে লোকের স্বাস্থ্য এবং সুখ অন্যায় রকমে বাধাপ্রাপ্ত না হয় তাহা করেন এবং যদি তাঁহারা ধর্ম্মানুমোদিত জীবন যাপন করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের বিপণি লুণ্ঠিত হইবে না। লোভবশতঃ শাইলকের অবতার হইলে, লোকের বিদ্বেষভাজন হইতে হইবে। হিন্দুশাস্ত্রে কুসীদ-ব্যবসায় ঘৃণ্য নহে, ঋণদাতার প্রয়োজন আমাদের নীতি-শিক্ষকেরা জানিতেন এবং ঋণদান করা অধর্ম্মের কার্য্য নহে। কিন্তু ঋণকে তখন লোকেরা পাপ মনে করিত, ঋণ-পাপকে স্বর্গের পথে বাধাস্বরূপ মনে করা হইত, ঋণ-স্বীকার করিয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করা অন্যায় মনে হইত না। কিন্তু ইউরোপীয় নীতিতে ঋণ-অস্বীকার অতি প্রাচীন কালেও ব্যবস্থিত দেখা যায়। এথেন্‌স্‌নগরে Solon আইন প্রণয়ন করিয়া ঋণ অস্বীকার করার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন; রোমেও ঋণ অস্বীকার করা হইয়াছে, কেননা ঋণদাতৃগণ দরিদ্রদিগের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করিত। এদেশে দরিদ্রের প্রতি ধনিগণ পূর্ব্বে এরূপ অত্যাচার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। শূদ্রের প্রতি ব্যবহারও আমেরিকা প্রভৃতি সভ্যদেশের ক্রীতদাসের প্রতি ব্যবহার অপেক্ষা অনেক ভালই ছিল। শূদ্রগণও স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারিতেন, কেবল বেদে অধিকার ছিল না। এখন ত সকলেরই শিক্ষাপ্রাপ্তিবিষয়ে অধিকার রহিয়াছে, কিন্তু তথাপি শতকরা ৯৫ জনই নিরক্ষর এবং তাহাদের নীতি বা ধর্ম্ম শিক্ষার ত কোন ব্যবস্থাই নাই, কিন্তু পূর্ব্বে বেদে অধিকার নিষেধ করিলেও তাঁহারা কথক ও পাঠকগণের সাহায্যে ধর্ম্মবিষয়ক তত্ত্ব সাধারণ লোককে শিক্ষা দিয়াছেন এবং তাহার ফলেই আজও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বহু সাধু ও সাধক জন্মিয়া ধর্ম্ম-শিক্ষকের স্থান অধিকার করিতেছেন। পঞ্চমগণের মধ্যেও বহু সাধু এবং লোক-শিক্ষক প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। কবীর, দাদু প্রভৃতিও নিম্নশ্রেণীতে জন্মিয়া গভীর তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন, এবং এদেশে উচ্চবর্ণের লোকেরাও নিম্নস্তরের লোকের সাধুতার প্রভূত আদর করিয়াছেন। গুণের পূজা যে এদেশে হয় নাই, একথাও বলা যায় না; বস্তুতঃ আমাদের প্রধান অবতারগণ মহাবীর, বুদ্ধদেব, রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ সকলেই কার্য্য-কুশল ক্ষত্রিয়-বংশে জন্মিয়া লোক-শ্রেয়ঃ সাধন করিয়াছেন। ইহাতে কর্ম্মের প্রয়োজনও দেখান হইল এবং কর্ম্মীই যে সমাজ রক্ষা করিবেন, তাহাও বুঝাইয়া দেওয়া হইল। আজও মহাত্মা গান্ধী কর্ম্মী বলিয়াই এত আদৃত, তিনি যদি কেবল ধর্ম্ম-সাধনায় ব্যস্ত হইতেন, তাহা হইলে হয় ত কবীর বা দাদুর ন্যায় একটী সাধক-সম্প্রদায় গড়িতে পারিতেন; কিন্তু তিনি কর্ম্মী, তাই সমস্ত ভারত তাঁহাকে অবতারের আসন প্রদান করিয়াছে। তিনি বৈশ্যপ্রধান যুগের নায়ক, এবং বৈশ্যবংশে জন্মিয়াছেন। জাতিভেদ এইভাবে সমাজ-রক্ষার কার্য্যেই ব্যবহৃত হইয়াছে এবং প্রয়োজনমত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এখন যখন একই প্রকারের শিক্ষা ও সাধনা সকলের পক্ষে গ্রহণীয় হইয়া উঠিয়াছে, তখন পূর্ব্বের ন্যায় জাতিভেদ বজায় রাখা যাইবে না, কৃষ্টি ও বৃত্তি একরূপ-ধারণ করিলে মানুষও একরূপই ধারণ করিবে।

আমরা ত এখন কর্ম্মবাদ বিশ্বাস করি না, কিন্তু অনেক তত্ত্বের মীমাংসাও করিতে পারিতেছি না। কর্ম্মবাদী বলেন "রোগ-শোক-পরীতাপ-বন্ধন-ব্যসনানি চ। আত্মাপরাধ-বৃক্ষাণাং ফলান্যেতানি দেহিনাম্॥"—অর্থাৎ আমাদের যে সকল রোগ, শোক বা অন্য উপদ্রব অকারণে সংঘটিত মনে করি, কর্ম্মবাদী পূর্ব্বকৃত কর্ম্মে তাহা আরোপ করেন। আমরা সেই ভাবের ব্যাখ্যা গ্রাহ্য মনে করি না, কিন্তু কোন কারণও প্রদর্শন করিতে পারি না, তাহাতে মনে একটা বিদ্রোহের ভাব উপস্থিত হয়। সেই ভাবে দরিদ্রতা প্রভৃতিও বিদ্রোহভাব উৎপাদন করে, এবং আমাদের দুঃখদৈন্য সমাজের ও সমাজপতির ঘাড়ে নিক্ষিপ্ত হয়, এইরূপে একটা বৈপ্লবিক মনোভাব উৎপন্ন হইতেছে। ইহাতে অবশ্য সামাজিক প্রগতি লাভ হইতেছে,

কিন্তু এইরূপ প্রগতি সমাজকে কোথায় লইয়া যাইবে, বলা কঠিন। বর্ত্তমান সময়ে যে ধনী লোকের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিতেছে, তাহাতেই ত যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। ধনিগণও দরিদ্রের পীড়নে নানা কৌশল অবলম্বন করিতেছেন এবং শ্রমিকগণও তজ্জন্য সমাজকে ধ্বংস করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে। এক ধর্ম্মবিহীন অর্থাৎ সমাজ-ধ্বংসকারী প্রগতি-তত্ত্ব প্রচারিত হইতেছে, ইহাতে ধনী ও দরিদ্র উভয়েই নষ্ট হইতেছেন। মানব-সমাজ আর নীতিতে উন্নীত হইতে পারিতেছে না। ইউরোপের দশা ত আমরা দেখিতেছি এবং H. G. Wells'ও তাঁহার বিখ্যাত ইতিহাসে দুঃখ করিয়াছেন যে Europe ত আর Kingdom of God প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেন না। ধর্ম্মানুমোদিত নীতির পথে না চলিলে, মানুষ স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবে কিরূপে? Individualism এবং Nationalism ইউরোপকে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর করিয়া দিতেছে।

ইউরোপীয় গণতন্ত্রে যে ভাবে সাম্যবাদকে ভিত্তি করা হইয়াছে তাহাতে সত্যপ্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। সকল মানুষ সমান—এই কথাটা ত সত্য নহে, কাজেই গণ-তন্ত্রে একটা অসত্য ভাব ক্রিয়া করিতেছে। ফরাসী বিপ্লবের নায়কগণই Equality প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেন না, তাঁহারা যে নূতন প্রণালী (রাজতন্ত্র বাতিল করিয়া দিয়া) প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তাহাতে ৪০ লক্ষ অর্থাৎ ফ্রান্সের $\frac{1}{6}$ লোককে ভোট-দানের অধিকার দেওয়া হইল। তাঁহাদের তথাকথিত স্বাধীনতার ও মৈত্রীর আদর্শও তাঁহারা পরিত্যাগ করিয়া হিটলারের ন্যায় জার্ম্মানী, ইটালী, হলণ্ড, স্পেন প্রভৃতি দেশকে পদানত করিলেন। নেপোলিয়ান সম্রাট্ উপাধি লাভ করিয়া সিংহাসন-বিচ্যুত বুর্ব্বন-বংশীয় রাজগণের অপেক্ষাও যথেচ্ছাচারী শাসন প্রতিষ্ঠা করিলেন। আজও ইউরোপীয়েরা এই ভাবে ভোগপরায়ণ এবং ক্ষমতালিপ্সু হইয়া বৃথা কথা বলিতেছেন ও পৃথিবীকে মনুষ্যরক্তে প্লাবিত করিতেছেন, তাঁহাদের ভোগ-পরায়ণ মনোবৃত্তি কোন কিছুর বন্ধন মানে না—না নীতির, না ধর্ম্মের। খৃষ্টান ধর্ম্মের স্বর্গ বা নরক অবান্তর পদাথরূপে বিবেচিত। Sermon on the Mount এর নীতিসমূহও অকেজো বা unpractical এবং কাল্পনিক জীবনেই প্রযোজ্য বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। তাঁহাদের স্ত্রীপুরুষের মধ্যে সাম্যবাদ পারিবারিক জীবনকে বিষাক্ত করিয়া দিতেছে এবং বিবাহবন্ধন শিথিল হওয়াতে চরিত্রে পশুত্ব আসিয়া পড়িতেছে। লোকেরা নির্লজ্জ ভাবে স্বার্থ অন্বেষণ করিতেছে এবং পরস্পরকে বঞ্চনার জন্য নানা কৌশল উদ্ভাবন করিতেছে। শাসন-তন্ত্রে যে সকল আইন ও ব্যবস্থা প্রচলিত হইতেছে, তাহাতে শ্রেণী-বিশেষের স্বার্থহানি ঘটাইয়া অন্য শ্রেণী-বিশেষকে সুবিধা দান করা হইতেছে। নানাভাবে নিপীড়িত আমাদের এই দেশেও এই প্রকারের শ্রেণী-বিশেষের পীড়ন হইতেছে। আমাদের হিন্দুদিগের মধ্যে একতা নাই বলিয়া আমরা দুঃখ করি এবং বাস্তবিক আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে বহু অবতার, বহু গুরু, এবং বহু রাজ্য থাকাতে কখনো একতা সম্পাদিত হয় নাই, একথা দ্বিতীয় প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে। কিন্তু তথাপি বলিতে চাই যে, অধুনা যে ভাবে দল গড়িয়া ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ সভ্যের নায়কগণ দেশ শাসন করেন, এইরূপ স্বার্থ-প্রণোদিত একতা নিতান্ত দুর্নীতি-মূলক ও দুর্নীতিপোষক। ইহাতে সমাজে ধর্ম্ম বজায় রাখা কঠিন হইতেছে। ছলে বলে কৌশলে মানুষকে পশুর ন্যায় দলে আবদ্ধ করিয়া স্বার্থপর নায়কগণ পরিচালিত করেন। শাসকেরা কয়েকজন স্বাথবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করেন এবং অন্যান্য লোকদিগকে তাঁহাদের মতগ্রহণে বাধ্য করেন এবং এই একতা দ্বারা বিপক্ষের যুক্তিতর্ককে নিষ্ফল করিয়া দেন। Paradise Lost এ Milton এইরূপ দলগঠনের কাজ শয়তানের কাজ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইউরোপীয় গণতন্ত্রে এইরূপ শয়তানী ভাব সংক্রামিত

দেখা যাইতেছে। আমি দ্বিতীয় প্রবন্ধেই ইউরোপীয় সভ্যতার ধারা প্রদর্শন করার সময়ে বলিয়াছি যে ইউরোপের শাসন-প্রণালীতে এইরূপ শ্রেণী-বিদ্বেষ আবহমান কাল যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। আমাদের দেশে যে সব গণতন্ত্র প্রাচীন সময়ে কোনো কোনো রাজ্যে প্রবর্ত্তিত ছিল, তাহাতে কাহারো উপরে এই প্রকার অত্যাচার আচরিত হয় নাই। বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণ সকলের মত লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। তাঁহারা একমত না হইলে কোনো কাজ করিতেন না। ধর্ম্মবুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত হইলে যে সাম্যবাদ মানুষের মধ্যে দেখা যায়, তাহা অসত্য নহে। "ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ," কেনন্য ব্রহ্মসত্তাতে সকলেই সত্তাবান্, ইহাই সত্য সমদর্শন। প্রথম প্রথম খৃষ্টান সাধকগণও সকলের মতে চলিতে চেষ্টা করিতেন। ক্রমশঃ স্বার্থের ও প্রাধান্যলাভের লোভ তাঁহাদের মধ্যে জাগ্রত হইল এবং বিবাদের সূত্রপাত হইল। নিঃস্বার্থ একদল লোক তৈয়ার না করিতে পারিলে, কোনো সমাজই সুস্থ থাকিতে পারে না। এদেশের সভ্যতায় একদল নিঃস্বার্থ লোক গড়িয়া উঠিয়াছিলেন, তাই সমাজের স্বাস্থ্য ভাল ছিল। আজও আমার মনে হয় সর্ব্বত্যাগী কতক-গুলি লোক আছেন বলিয়াই হিন্দুরা টিকিয়া আছেন।

ইউরোপীয় সভ্যতায় বীরত্ব বা Heroism এর একটা ক্ষাত্র আদর্শ অতীব প্রাচীন সময় হইতে গড়িয়া উঠিয়াছে, যাহা আজ আমরা লোকনায়কগণের চরিত্রে বর্ত্তমান দেখিতেছি। হিট্‌লার, চার্চ্চিল প্রভৃতি লোকনায়কগণের মধ্যে যে দৃঢ়তা ও will power দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইতেছি, তাহা Napoleon বা Cromwellএও বিদ্যমান ছিল। Achilles, Hector প্রভৃতি হোমার-বর্ণিত বীরগণের মধ্যেও বর্ত্তমান দেখা যায়। তাঁহারা বীর ছিলেন এবং নির্ম্মমভাবে শত্রুকে ধ্বংশ করিয়াছেন। Milton এর Paradise L st এ শয়তানের মধ্যে এইভাবের ইচ্ছাশক্তির ও স্বাধীনতাপ্রবণতার বিকাশ দেখি এবং ইউরোপীয় প্রত্যেক শাসনকর্ত্তা ও নায়কের মধ্যে এই ভাবের দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছাশক্তির সাধনা হয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের মধ্যে এই প্রকার স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্ব দেখা যায় না; তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমাদের পারিবারিক বন্ধন, শাস্ত্র ও গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা এবং ইহজীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব-সম্বন্ধে সচেতন ভাব এইরূপ স্বাধীনতা-প্রবৃত্তিকে দমন করিয়াছে। আমাদের বীর অর্জ্জুন; তিনি দার্শনিক বিচার করিয়া যখন ধর্ম্মের আদর্শ দ্বারা নিঃসন্দেহ হইলেন যে যুদ্ধ তাঁহার কর্ত্তব্য, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, "আমি তোমার আদেশ পালন করিব এবং আমার সন্দেহ দূরীভূত হইয়াছে"। শ্রীকৃষ্ণ নিজে ন্যস্তশস্ত্র, কেননা তিনি সত্ত্বগুণের দ্বারা পরিচালিত, তিনি অর্জ্জুনকে দিয়া যুদ্ধ করাইলেন। আমাদের ব্রাহ্মণেরাও 'ন্যস্ত-শস্ত্র' ছিলেন। সকলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলে মহাত্মা গান্ধীর Non-violenceএর আদর্শ অবলম্বন করিতেই হইবে, কিন্তু রজোগুণের সেবা করিয়া সত্ত্বগুণের কথা বৃথা বলা যাইতে পারে। আমাদের বীর অর্জ্জুন জ্ঞানভক্তি-সমন্বিত যে কর্ম্ম তাহা করিতে ব্রতী হইলেন। এইরূপ বিচার দ্বারাই অর্থাৎ পরলোক ও লোকশ্রেয়ঃসাধন এই উভয় আদর্শ দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই কর্ম্ম করিতে হইবে। কেবল দৈহিক জীবনের সুখ-সুবিধার প্ররোচনায় কর্ম্ম করিলে, সেই কর্ম্ম শুদ্ধ হইবে না; ইহাতে অহঙ্কার বৃদ্ধি পাইবে, এবং জীবনের উচ্চ আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইতে হইবে। আমাদের দেশে উনবিংশ শতাব্দীতে সে সকল লোকনায়ক কর্ম্ম করিয়া দেশের দুঃখ-দুর্দশা দূর করিতে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রামমোহন রায়কেই সর্ব্বাগ্রে স্মরণ করিতে হয় এবং তাঁহার মধ্যে যে পৌরুষ দেখিতে পাই, তাহাই হিন্দুর আদর্শ বলিয়া মনে করি। আমাদের বীরগণ উচ্চ আদর্শেরই সেবা করিয়াছেন। রামমোহনের ন্যায় বিচারশীল লোকেরাই আমাদের নেতা হইবেন। আচার্য্য

স্বর্গীয় জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের স্বলিখিত "অব্যক্ত" নামক প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়, আমাদের আদর্শ বিজ্ঞানাচার্য্য কি ভাবে কাজ করিবেন। আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের মধ্যে প্রাচীন আদর্শই ক্রিয়া করিয়াছে। ঈশ্বরে বিশ্বাস দ্বারা অনুপ্রাণিত লোকদিগকেই আমরা নেতৃত্ব দান করি। চরিত্রবিহীন নেতারা এই দেশ পরিচালিত করিতে পারিবেন না। শ্রীরামচন্দ্র ও অর্জ্জুনই আমাদের দেশের চরিত্রের আদর্শ হইয়া রহিয়াছেন। বুদ্ধি, সাহস, জ্ঞান ও হৃদয়বত্তা, সবই চাই। সর্ব্বোপরি প্রবলভাবে স্বার্থান্বেষণ-বর্জ্জন করিয়া লোকনায়ক হইতে হইবে। শয়তানের যে আদর্শ তাহা এদেশে গ্রহণীয় হইতে পারে না। শয়তানের মধ্যে দলপতিত্ব-লাভের অনেক গুণ বর্ত্তমান আছে, সত্য। শয়তান কিছুতেই নিরাশ নহে, তাহার অদম্য স্বাধীনতাস্পৃহা রহিয়াছে, দলের বন্ধুদের জন্য শয়তান দুঃখিত এবং সর্ব্বাপেক্ষা বিপদ্-জনক কার্য্যে অগ্রগামী; শয়তান হিরণ্যকশিপুর ন্যায় অন্য কাহারো প্রভুত্ব-স্বীকারে নারাজ। কিন্তু হিরণ্যকশিপু আমাদের আদর্শ নহে। আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী এবং তদনুসারে জীবন-পরিচালনে সমর্থ ব্যক্তিকেই নেতৃত্বে বরণ করি। আমাদের হৃদয়ের অর্ঘ্য আমরা সকলকে দিতে প্রস্তুত নহি। অসংযতেন্দ্রিয় এবং স্বার্থ-পরিচালিত নেতার স্থান এদেশবাসীর হৃদয়ে হইতে পারে না।

গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

হে অর্জ্জুন, ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়ে থাকিয়া, তাহাদিগকে পরিচালিত করেন। তাহারা তাঁহার শক্তিতেই যন্ত্রারূঢ়বৎ পরিচালিত হইতেছে। ঈশ্বরের শক্তিতেই জগৎ-যন্ত্র পরিচালিত, আমরা তাঁহার হাতে যন্ত্রস্বরূপ। এই বিশ্বাস-দ্বারা পরিচালিত হওয়াতে নীতির অনুশাসন ধর্ম্মের অনুশাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। তজ্জন্য এদেশের সাধারণ লোকের বিশ্বাস ও কার্য্য আমাদের মতানুযায়ী অনেক নীতির বিরুদ্ধ মনে হয়। তাঁহারা জীবনে ধর্ম্মকেই প্রধান সাধ্য মনে করেন, সুতরাং বাল্য-বিবাহ, জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতাদি রীতি ধর্ম্মানুশাসনে বিহিত হইয়া রহিয়াছে। আমরা পশুবলিদান-দ্বারা ধর্ম্মলাভ হয় বুঝি না, কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্ম-বিশ্বাসে প্রণোদিত তাঁহারা ইহাতে কিছুই অন্যায় দেখেন না। রক্ত দেবতাকে দিলে পাপ বিধৌত হয়, এই বিশ্বাস হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান সকলেরই আছে। যীশুর রক্তে মানবীয় পাপ বিধৌত হইয়াছে; ইহাত খুব পণ্ডিত খৃষ্টানও বিশ্বাস করিতেছেন। বাল্য-বিবাহাদি-ব্যাপারও এই ভাবেই ধর্ম্ম-বিশ্বাস-দ্বারা সঞ্জীবিত রহিয়াছে। যৌক্তিক মনোবৃত্তি এবং ইউরোপীয় নীতিবাদের প্রসারতা এই বিশ্বাসকে স্থানচ্যুত করিবে, কিন্তু তাহাতে মানুষের স্বার্থপরতাই বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। Utilitarian মতবাদ বা greatest good cf the greatest number রূপ যে নীতি তাহাতে gieatest goodটী দৈহিক আরাম ও ঐহিক সুখ-সুবিধা মাত্র। ইহাতে পরকালে বিশ্বাসের গন্ধও নাই। Disinterested ভাবে যে কর্ম্ম করার উপদেশ দেওয়া হয় এবং Catego ical Imperative বা Dutyর আদেশ-পালন-রূপ যে নীতির কথা বলা হয়, তাহাতেও মানুষকে ঈশ্বর-বিশ্বাসে প্রণোদিত করা হয় না। কেবল নিঃস্বার্থ ভাবের কর্ম্ম এদেশের আদর্শ নহে এবং তজ্জন্যই বৌদ্ধ ধর্ম্ম স্থায়ী হইতে পারে নাই। ভগবানে কর্ম্ম, অর্পণ করিয়া তাঁহার প্রীতির জন্য কর্ম্ম-সম্পাদন এদেশের আদর্শ। অবশ্য কোন্ কর্ম্ম-দ্বারা ভগবানের প্রীতি সম্পাদিত হইবে তাহার বিচার প্রয়োজন। কাফেরকে বা তপস্যাকারী শূদ্রকে হত্যা করা বা Hereticকে জলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ করাও ত ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল,

আজও যে বিবেচিত হয় না, তাহা ত বলিতে পারি না। কিন্তু হিন্দু নীতিতে এবংবিধ ধর্ম্মের ব্যবস্থা দেওয়া হয় নাই। মহাভারত ইত্যাদি শাস্ত্রে যে সব নীতির কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে বিশ্বজনীন ভাবই অধিক বিকশিত। সর্ব্বভূতের হিত যাহাতে হইতে পারে, এইরূপ কার্য্যেরই ব্যবস্থা রহিয়াছে। অবশ্য মহাভারত ইত্যাদি শাস্ত্রে যে ব্রাহ্মণের জন্যই বিশ্ব, এইরূপ কথাও আছে, কিন্তু সেইগুলি পরে স্বার্থপরতা-প্রণোদিত লোকের লিখিত মনে হয়। গীতাই আমাদের প্রধান নীতিশাস্ত্র; তাহাতে শ্রেণী-বিশেষের সুবিধার জন্য কোনো কথা বলা হয় নাই। সত্ব, রজঃ, তমঃ প্রভৃতি গুণ বিভাগ করিয়া সকল মানুষের জন্যই কতকগুলি সদ্‌গুণ আদর্শরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। মানুষ ঈশ্বর-প্রীতি-দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার হাতে যন্ত্রস্বরূপ হইয়া কার্য্য করিবে, এই আদর্শই গীতাতে প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। কর্ম্মের আদর্শকেই নীতিশাস্ত্রের মূল শিক্ষা ধরিতে হইবে। কর্ম্মের আদর্শের বিচার-দ্বারাই নীতির মাপকাঠি নির্ণয় হইতে পারে।

এখন আমি আমাদের দেশে কি ভাবে নীতি দোষপ্রাপ্ত হইতেছে এবং নীতি শিক্ষার কি ব্যবস্থা চলিতেছে, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। আমাদের বাল্যাবধি আমরা ইউরোপীয় ভাবধারার সংস্পর্শেই অধিক আসিতেছি। পূর্ব্বের ন্যায় চাণক্য-শ্লোক বা আমাদের দেশীয় নীতি আর শিক্ষা দেওয়া হয় না। মহাভারতাদি গ্রন্থও আর আমরা পাঠ করি না। ইউরোপীয়েরা আসিয়া যে সব সমালোচনা আমাদের শাস্ত্রের করেন, তাহা আমরা পাঠ করি, কিন্তু অনুসন্ধান করি না তাঁহাদের কথার মূল্য কতটুকু। তাঁহারা বলেন এদেশে মিথ্যা বলা পাপ নয়, কেননা মনুতে ইহা বলা হইয়াছে। কিন্তু আমার মতে একথাটা ঠিক নহে। যে কয়টা বিষয়ে, অর্থাৎ 'বিবাহে, গবাং ভক্ষ্যে' ইত্যাদি বিষয়ে মিথ্যা-ব্যবহারের সমর্থন আছে, সেই সব বিষয়ে হয়ত আজ কেহ মিথ্যা বলা আবশ্যক বোধ করেন না, কিন্তু বহু বিষয়ে আজকাল সকলেই মিথ্যা বলিতেছেন। "Language was given to man to hide his thoughts," এই সত্যটী প্রত্যেক লোকের সঙ্গে আলাপ করিলেই আমরা বুঝিতে পারি। আমরা যে ক্রমশঃ অসরল ও অসংযত-বাক্ হইতেছি তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে লোকেরা অসত্য-ভাষণে যেরূপ ভয় পাইতেন, সভ্য মানুষের আজ সেই ভয় নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে উপনিষদে বলা হইয়াছে "যোঽনৃতম্ অভিবদতি স সমূল এব বিনশ্যতি"। রামায়ণে কৌশল্যা দশরথকে ভর্ৎসনা করিতে যাইয়া সত্যরক্ষা-সম্বন্ধে যে সব কথা বলিয়াছেন, সেইরূপ কথা অন্য কোথাও পাওয়া যাইবে না। "অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্। তুলয়িত্বা তু পশ্যামি সত্যমেবাতিরিচ্যতে॥"—ইহাতে সত্যের প্রতি কিরূপ মনোভাব প্রকাশ পায়? আমাদের শাস্ত্রে বলা হইয়াছে "যতবাক্-কায়-মানস" হইতে হইবে। অর্থাৎ বাক্য, শরীর ও মন তিনকেই সংযত রাখিতে হইবে। তন্মধ্যে বাক্যসংযমই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। সত্য বলিতে শিশুদিগকে শিক্ষা দিতে হয়। এদেশে যে সরলতা আজও দেখি, তাহাতে এদেশে সত্যকথনের অভ্যাসই প্রমাণিত হয়। অশিক্ষিত লোকের ব্যবহারে সরলতারই পরিচয় পাই। সত্য বলাই মানুষের স্বভাব। পার্ব্বত্য লোকদিগের মধ্যে সত্যের অধিক ব্যবহার দেখা যায়। সভ্য মানুষেরাই মনে এক কথা এবং মুখে অন্য কথা বলেন। Rousseau যে savage কে noble বলিয়াছিলেন এবং ইউরোপবাসীকে সভ্যতার দোষ দেখাইয়াছিলেন, সেই কথা আজও ঠিক রহিয়াছে। ধর্ম্ম-বিশ্বাস ঠিক থাকিলে, নীতিজ্ঞানও ঠিক থাকে। যদি আমাদের শিক্ষাতে প্রাচীন ভাবধারার স্থান করা হয় এবং প্রাচীন আদর্শ বালক-বালিকাগণের সম্মুখে ধরা হয়, তাহা হইলে তাহারা সাড়া দিবে।

ইউরোপীয় শ্রেষ্ঠতার মোহ কাটাইয়া যদি আমরা আমাদের প্রাচীন ধারার সহিত যোগ সাধন করিতে পারি তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, এই দেশে নীতিশিক্ষার যে ব্যবস্থা ছিল

তাহা আজও বিশেষ সমীচীন। হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থের মূল্য আজও বিশেষ আছে। আমি পরবর্ত্তী প্রবন্ধে শিক্ষাবিষয়ে আরও আলোচনা করিব, সুতরাং এখানে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

আমাদের দেশীয় লোকদের মধ্যে যে সব হীনতা আমরা লক্ষ্য করি, সেইগুলি অবস্থা-প্রসূত। পরাধীন জাতির মধ্যে দেশের জন্য দায়িত্বজ্ঞান না থাকাতে, তাহাদের মধ্যে পারিবারিক স্বার্থই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের স্বদেশহিতৈষণা জীবনে কার্য্যকরী হইতেছে না, কেননা দেশরক্ষার বা শান্তিরক্ষার ভার আমাদের উপর নহে। দেশের মঙ্গলামঙ্গলের জন্য আমরা দায়ী নহি। এদেশের লোকেরা ত হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া নিজেদের রক্ষার কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন অনেকের বিশ্বাস আমাদের আত্মরক্ষা করা কঠিন। আমাদের মধ্যে একতা নাই সত্য, কেননা আমরা একযোগে কোনো কাজ ত করি না এবং পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাবই বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইতেছে। আমাদের শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা প্রভৃতি সবই বিদেশীয়দের ব্যবস্থানত চলিতেছে এবং তাঁহারা নিজেদের সভ্যতা ও ভাবধারা অনুসারেই চলেন এবং আমরাও অনেকে তাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠতার আসন দিয়া নতি স্বীকার করিয়াছি। আমাদের নীতি ও আদর্শসমূহ অকেজো বলিয়াই আমরা ধরিয়া লইয়াছি এবং শতাধিক বৎসর যাবৎ এই মোহ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। পণ্ডিতগণ ইউরোপীয় দর্শন, ইউরোপীয় ইতিহাস, ইউরোপীয় সাহিত্য পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া দেশের যে হাওয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাই আমরা নিশ্বাসে প্রশ্বাসে পাইতেছি; তাহাতে আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতা হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে, এদেশের লোকের চরিত্রে যে মহত্ব ছিল তাহা লোপ পাইতেছে। আমরা ত আমাদের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া অন্য আদর্শ গ্রহণ করি নাই; বিদেশী আদর্শ আমাদের ঘাড়ে ভূতের ন্যায় চাপিয়াছে এবং আমাদের আদর্শ বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে।

আমার দৃঢ় ধারণা—যে স্বার্থপরতা, অসরলতা, ভীরুতা ও দুর্ব্বলতা, এক কথায় যে চরিত্র-হীনতা আমাদের মধ্যে আজ প্রবল ভাব ধারণ করিয়াছে, তাহার মূল কারণ রাজনৈতিক পরাধীনতা। আমি পূর্ব্বেই দ্বিতীয় প্রবন্ধে বলিয়াছি যে রাষ্ট্রতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র পরস্পরের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত, কিন্তু বহুকাল যাবৎ এদেশে রাষ্ট্র এবং সমাজ ভিন্ন আদর্শে পরিচালিত হইতেছে, তাহাতেই এদেশের মানুষের মধ্যে কতকগুলি অসামঞ্জস্য গড়িয়া উঠিয়াছে। যিনি আজ patriot তিনি কাল চাকুরী পাইলে অন্য রূপ ধারণ করেন। ইহাতে নীতি ব্যাহত হইতেছে। আমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের মধ্যে দেশের মঙ্গলের সহিত নিজের মঙ্গলের সামঞ্জস্য-লাভ ঘটিতেছে না; আমরা যদি দেশের সেবা বরণ করি, তাহা হইলে আমাদের ভাগ্যে নির্যাতনই বিহিত হয়। যাঁহারা দেশের উপকারের ভান করেন তাঁহারাই শাসকগণের নিকট আদৃত হইতেছেন। স্বাধীন জাতিগণের মধ্যে যে সব আদর্শ মানব-হৃদয়ে সঞ্জাত হয়, তাঁহাদের পূর্ণ পরিণতি হয় দেশের ও সমাজের কার্য্যে। আমাদেরও শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারগণ সমাজের কার্য্যেই জীবনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু আজ আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এইরূপ নিঃস্বার্থ উদ্দেশ্যকে বরণ করিতে পারিতেছে না। যাঁহারাই শক্তিশালী, তাঁহাদিগকে লোভ দ্বারা পথভ্রষ্ট করা হয়। এই অবনতি অনিবার্য্য। Mill বলিয়াছেন, যেস্থানে কেহ দেশের জন্য দায়ী থাকে, সেই খানে সেই একমাত্র patriot, অন্যেরা নিজেদের মঙ্গলসাধনে ব্রতী। এইভাবে আমাদের শিক্ষায় ও জীবনে স্বার্থানুসন্ধানই প্রধান চিন্তার বিষয়। কিন্তু মানুষ নীতিমান্ ও চরিত্রবান্ হইয়াছে স্বার্থের উপরে উঠিয়া। মাতা শিশুর জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দেন, তজ্জন্যই তিনি দেবী, পিতা সন্তানের মঙ্গলবিধানে ব্রতী, তাই তিনি

আকাশ হইতেও উচ্চ ; জ্ঞানী সমাজের সেবা করেন জ্ঞান দ্বারা, তাই তিনি আচার্য্য। এইভাবেই পরার্থপরতা অবলম্বন করিয়া মানুষ মহীয়ান্ হইয়াছে। আমরা পরার্থপর হইতে পারিতেছি না। প্রত্যেক মানুষ মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় পরার্থপরতার আদর্শ গ্রহণ করিতে পারে, যদি তাহাকে সেই সুবিধা দেওয়া হয়। পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া কদাচিৎ কেহ এই আদর্শ গ্রহণ করিতে পারেন।

---

(৫) বিদেশী সভ্যতার সংঘাত

আমাদের স্বর্গগত প্রিয় কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ যে ভারতকে মহামানবের মিলনতীর্থ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন তাহা অতীব সত্য। এখানে মানবজাতির সকল শাখার মিলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে। এখানে আর্য্য, অনার্য্য, শক, হূন, হিন্দু, মুসলমান, পারসিক, তাতার, ইংরেজ, ফরাসী, ডচ্, দিনেমার, পর্ত্তুগীজ, জাপানী, চৈনিক ইত্যাদি সকল জাতীয় নরনারী সাদরে গৃহীত আছেন। এখানে যাঁহারা ঘর বাঁধিবেন, তাঁহাদিগের মধ্যে ভেদপ্রসূত পাকিস্থান বা এংগ্লোস্থান ইত্যাদি নামক পৃথক্ স্থানের প্রয়োজন নাই, এক দেশ-মাতৃকার ক্রোড়ে সকলেরই স্থান আছে। প্রাচীন সময়ে বৈদিক ঋষিগণ সমস্ত মানবজাতির ভিতরে যে এক আত্মা বর্ত্তমান তাহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা সকলকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন : "হে অমৃতের পুত্রগণ, শোন, শোন সকলে, আমি অন্ধকারের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের অতীত যে জ্যোতির্ম্ময় ধাম আছে, তাহার দেবতাকে জানিয়াছি। তাঁহাকে জানিলে আর মৃত্যুভয় থাকে না। তোমরা তাঁহাকে নিজ নিজ আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত জানিতে চেষ্টা কর, এই সত্য লাভ করিলে জগৎ শান্তিলাভ করিবে।" জগৎবাসী লোকেরা রবীন্দ্রনাথের কবিতায়ও এই বাণী শুনিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন এবং তাঁহাকে গুরু বলিয়া অভিবাদন করিয়াছেন।

ভারতের এই বিশ্বজনীন আত্মা তাহাকে সকল মানবকে সাদরে গ্রহণ করার শক্তি দান করিয়াছে। ভারত মানবজাতির অন্তর্গত সকলের মাতৃত্ব লাভ করিয়াছেন। অন্ধগণও মায়ের স্তন্য পান করিয়া পুষ্ট হইতেছেন, কিন্তু মায়ের মুখখানা দেখেন নাই, মনে হয়, তাই মাতাকে ভাগ-বাটোয়ারা করিতে চাহিতেছেন। তাহারা মাকে মা বলিয়া ডাকিতে যেন নারাজ মনে হয়। কৃতঘ্ন সন্তানের অভাব দুনিয়াতে নাই, তথাপি মায়ের স্নেহ তাহাদের জন্যও অব্যাহত ভাবেই প্রবাহিত হয়। কবি তাই গাইলেন, "একবার তোরা মা বলিয়া ডাক, জগৎ-জনের শ্রবণ জুড়াক"। বাস্তবিক যদি ভারতবাসিগণ ভারতের মাতৃত্ব স্বীকারপূর্ব্বক একযোগে মা বলিতে পারেন, তবে ভারতে যে সভ্যতার সৃষ্টি হইবে, তাহাতে জগতে একটী অপূর্ব্ব কৃষ্টি সম্ভাবিত হইবে। সকল প্রকারের ভেদ ও বৈরভাব বিদূরিত হইয়া মহামানবের ভবিষ্যৎ কৃষ্টি যে কি আকার ধারণ করিবে, তাহা ভারতে দেখা যাইবে। ভারত এই ভাবে মানবজাতির পথপ্রদর্শক হইবে। কেননা যে বিশ্বজনীনতা ও উদারতা ভারতে প্রাচীন সময়েই প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়, তাহা এই নবভাবে পরিণতি লাভ করিলে মানবের মঙ্গলের জন্য একটী অপূর্ব্ব সমন্বয় গড়িয়া উঠিবে।

ভারত সর্ব্বদাই বিদেশী আঘাতে সাড়া দিতেছে, ভারত মৃত নয়। ভারতের আর্য্য-সভ্যতায় অনার্য্যদের রীতিনীতি কিছু কিছু গৃহীত হইয়াছে। কোনো প্রকারের সত্যই ভারতে অগ্রাহ্য হয় নাই। গ্রীকগণের নিকট হইতে ভারত অনেক সত্য গ্রহণ করিয়াছে। শক, হূন প্রভৃতি বিদেশীয়গণ ভারতের অঙ্গে স্থান লাভ করিয়া স্বেচ্ছায় হিন্দু কৃষ্টি গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতীয় জ্যোতিষ, স্থপতিশিল্প, ভাস্কর্য্যবিদ্যা যে গ্রীক-প্রভাবে উন্নত হইয়াছে তাহা ত ইতিহাসে বর্ণিত আছে। জীবন্ত সভ্যতাই এই ভাবে সাড়া দিতে পারে।

গ্রীক রাজা Minender বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যে দার্শনিক গ্রন্থ "Questions of Milinda" লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে ভারতের দার্শনিক সম্পদ্ বৃদ্ধি পাইয়াছে। Indologistগণ ভারতীয় তত্ত্বের যে সমস্ত ব্যাখ্যা ও টীকা লিখিয়াছেন ও লিখিতেছেন, তাহাতেও ভারতের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হইয়াছে। গ্রীকগণের আঘাতে ভারত যে সাড়া দিয়াছিল ইস্‌লামের গুরুতর আঘাতে তাহা অপেক্ষা অধিক সতেজ সাড়াই দিয়াছে। চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকগণকে পরাস্ত করিয়া ভারতের সীমার বাহিরে বিতাড়িত করিয়াছিলেন, তথাপি পরে গ্রীক-কৃষ্টি ভারত গ্রহণ করিয়াছেন। ইস্‌লামের আক্রমণে ভারত কি ভাবে আত্মরক্ষা করিয়াছে, তাহা দ্বিতীয় প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। এখানে এইটুকু বলিলেই চলিবে যে ইসলাম-ধর্ম্মাবলম্বিগণও ভারতের সন্তানত্ব লাভ করিয়াছেন এবং এই দেশের জলমাটীতেই নির্ম্মিত হইয়া মানুষ হইতেছেন। ইস্‌লামের একেশ্বরবাদ অনেক হিন্দুসন্তান স্বীকার করিয়াছেন বলিয়াই, আজ মুসলমানেরা সংখ্যার গৌরব করেন। হিন্দুর আত্মাতে এক ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল বলিয়াই অনেক হিন্দু ইস্‌লামকে সাক্ষাৎ-ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। গুরুনানক প্রভৃতি মধ্যযুগীয় সাধকগণ ইস্‌লাম-প্রভাবে হিন্দুর বিশ্বাসকে সার্ব্বজনীনতা দান করিয়া হিন্দু ও মুসলমান কৃষ্টির সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। এই সমস্ত নব নব সম্প্রদায় গড়াতে ভারত আধ্যাত্মিক সম্পদ্-বৈচিত্র্য লাভ করিয়া ভবিষ্যৎ বিশ্বজনীন কৃষ্টির পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বারো হাজার বৎসর বয়স্ক মানবজাতি এবং মানবসভ্যতা ভবিষ্যতে কি আকার ধারণ করিবে অনুমান করা কঠিন, তথাপি যে বিশ্বজনীন মহামানব ভবিষ্যতে জন্মিবে তাহার সূচনা ভারতেই দেখা যাইতেছে। ভারতীয় সভ্যতার অঙ্গে যিনিই আঘাত দিতেছেন, ভারত তাহাকেই গ্রহণ করিয়া নিজের অঙ্গীভূত করিয়া লইতেছে। ইস্‌লামিক গূঢ় সাধনাসমূহও, যথা মুতাজিল সম্প্রদায়ের ভাব, সুফীদিগের ভাব এবং আউলিয়া ফকির-গণের ভাব, এদেশের সাধনাতে প্রবিষ্ট হইয়াছে। আমার ত মনে হয়, আমাদের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবে যাহাকে ব্রজের ভাব বলা হয়, তাহাতে সুফীগণের প্রেমের ভাব কিছু প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। যদিও আমি নিশ্চিত ভাবে কিছু বলিতে পারিব না, তথাপি আমার বিশ্বাস শ্রীগৌরাঙ্গদেব যে এই নূতন ভাবটীকে জীবন্ত করিয়া তুলিলেন, তাহাতে ইস্‌লামিক হাওয়ার প্রভাব কিছু বিদ্যমান আছে। ইউরোপে যে woman-worship মধ্যযুগের knight গণের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহাতে কোনো কোনো লোকের মতে Saracenic অর্থাৎ আরবগণের প্রভাব রহিয়াছে। তাঁহারাই পারস্য প্রভৃতি স্থানে প্রিয়তমাকে স্বর্গীয় পরীরূপে দেখিতে আরম্ভ করেন। গ্রীক, রোমক বা ইহুদীগণের মধ্যে womanএর প্রতি অবজ্ঞার ভাবই ছিল। woman হিব্রুগণের মতে আত্মাবিহীন। মুসলমান-প্রভাবেই হয়ত রাধা-cultটী তাজা হইয়াছিল। দক্ষিণ ভারতে ভক্তির জন্ম বলা হয়, যথা—

উৎপন্না দ্রাবিড়ে সাহং বৃদ্ধিং কর্ণাটকে গতা।
ক্বচিৎ ক্বচিদ্ মহারাষ্ট্রে গুর্জরে জীর্ণতাং গতা॥

ভক্তির প্রকাশে দ্রাবিড় দেশের খ্যাতি রহিয়াছে। পদ্মপুরাণেও এই কথা বলা হইয়াছে।

কিন্তু এই ভক্তিতে Radha-cult trace করা যায় কিনা, সন্দেহ। উত্তর ভারতে একটী রাধাস্বামী-সম্প্রদায় আছেন। জানিনা তাঁহাদের মধ্যে এই সম্বন্ধে আলোচনা হয় কি না। প্রভুভাবে, পিতৃভাবে, প্রাণের প্রাণভাবে উপনিষদে তাঁহাকে দেখা হইয়াছে। মাতৃভাব পরে বঙ্গদেশে প্রাবল্য ধারণ করিয়াছে। এই সমস্তই হিন্দু-শাস্ত্রানুমোদিত, যদিও Mother cult সম্বন্ধে বিদেশী প্রভাব থাকা অসম্ভব নয়। কেননা মিশরীয় Isis-এ মাতত্বের ভাব দেখা যায়। ভারতীয় আধ্যাত্মিক তত্ত্বে এমন একটা সতেজ উদারতা রহিয়াছে যে আমরা যে কোনো উত্তম ভাবকে গ্রহণ করিয়া নিজস্ব করিয়া লইতে পারি। আমরা শুধু পরমত-সহনশীল নহি, আমরা গ্রহণশীলও বটে। আমাদের প্রশস্ত ভাবধারাতে অন্য যে কোনো ভাব গ্রহণ করিয়া তাহাকে সাধনার অঙ্গীভূত করিতে পারি। তাই আমাদের নায়কগণ ইউরোপীয় জ্ঞান ও ধর্ম্ম-সাধনাকে গ্রহণ করিয়া আমাদের নব শিক্ষার ও নব দীক্ষার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে আঘাত পলাশীক্ষেত্রে প্রদত্ত হইল, তাহাতে ভারত যে সাড়া দিয়াছে, তাহাতেই নব্যভারতের সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা ইউরোপের জ্ঞান, ইউরোপীয় সাহিত্য, দর্শনাদি গ্রহণ করিয়া হজম করিতেছি। বিজ্ঞানাচার্য্যগণ যে ভাবে সাড়া দিতেছেন, তাহাতে ভারতীয় মনীষার কৃতিত্ব প্রমাণিত হইতেছে। রামমোহন রায় যে ভাবে সাড়া দিয়াছিলেন, সেই পথই প্রশস্ত মনে হয়, কেননা তিনি Europeanised না হইয়াও ইউরোপীয় কৃষ্টিকে আত্মস্থ করিয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যে National soul বা হিন্দু আত্মার কোনো বিকৃতি ঘটিয়াছিল মনে হয় না। তিনি ঋষিদের সন্তান; তাঁহাদের ভূমিতেই দণ্ডায়মান থাকিয়া যাহা নূতন সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, তাহা গ্রহণ করিলেন এবং ইউরোপীয় শিক্ষা গ্রহণের জন্য দেশকে আহ্বান করিলেন। ভারত আঘাত পাইয়াই জাগিতেছে এবং নব শক্তি লাভ করিয়া ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হইতেছে। ইউরোপীয় সভ্যতার আঘাতে যে নবজাগরণ লাভ হইয়াছে, তাহাতেই আমরা নূতন ভারত গড়িতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমাদের ভুলভ্রান্তি হইতেছে সত্য, কেননা বিদেশী ভাবধারার কতটা কি ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারিতেছি না। একশত বৎসর যাবৎ আমরা যে শিক্ষালাভ করিতেছি, তাহার দোষত্রুটী আমরা অনেকটা বুঝি, তথাপি কোনো প্রতীকার করিতে পারিতেছি না। একশত বৎসর যাবৎ চাকুরীজীবী হইয়া দাসত্ব বা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। আমাদের শাসনকর্ত্তারা আমাদের হাত হইতে ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, ও বৈশ্যত্ব কাড়িয়া লইয়াছেন। তাঁহারাই আমাদের শিক্ষাদাতা, শাসনকর্ত্তা এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সবই তাঁহাদের হাতে। আমরা তাঁহাদের হুকুম তামিল করি। শূদ্রদেরও Initiative এর ক্ষমতা ছিল না। এখন সব organisation ইউরোপীয়েরাই গঠন করিতেছেন। আমাদের শূদ্রত্ব যে কিরূপে দূর হইবে, তাহা বলা কঠিন, চেষ্টা হইতেছে মাত্র। যাঁহারা ব্রাহ্মণত্ব বা ক্ষত্রিয়ত্ব তাঁহাদের অনুগ্রহে লাভ করিতেছেন, তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্ব এবং ক্ষত্রিয়ত্বও খাঁটী নহে। আমাদের আত্মায় যে আধ্যাত্মিক শক্তি ঋষিদের সাধনায় লাভ হইয়াছিল, তাহা আজও অবিকৃত আছে; ঋষি বলেন মানবের প্রথম জন্ম পিতৃদেহে, দ্বিতীয় জন্ম মাতৃদেহে এবং তৃতীয় জন্মলাভ হবে পরলোকে, আমরা পিতৃ-মাতৃ-রক্তের সহিতই আত্মা লাভ করি, তাই আমাদের শূদ্রত্ব-প্রাপ্তি-সত্ত্বেও আমরা অভিভূত হই নাই। আমাদের মধ্যে বহুকাল যাবৎই অর্থাৎ রামমোহনের সময় হইতে একটা নব জাগরণ দেখা দিয়াছে; উনবিংশ শতাব্দী হইতেই এই জাগরণের ফলে আমরা আধ্যাত্মিক, সামাজিক এবং শিল্পবিষয়ে কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কিরূপে আমাদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া আমরা অগ্রসর হইতে পারি, তাহার চেষ্টা করিতেছি। হিন্দুর হিন্দু-আত্মা বজায় রাখিতে না পারিলে আমাদের বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজন নাই। বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষা দ্বারা এই আত্মা দূষিত হইতেছে, রজঃপ্রধান হইয়া উঠিতেছে; ইহাতেই বিচলিত হইয়া

এই ভাবে কথা বলিতেছি। চিন্তাশীল লোকেরা আমাদের দৃষ্টি প্রাচীনের দিকে ফিরাইয়াছেন এবং পৈত্রিক সম্পত্তি কি আছে তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইউরোপীয় ভাবধারা প্রথম প্রথম আমাদের চোখ ঝলসাইয়া দিয়াছিল সত্য, কিন্তু চক্ষুষ্মান্ লোকেরা সেই আলোক ভেদ করিয়া ইউরোপের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করিতেছেন। সিপাহী বিদ্রোহের পর হইতেই নব শিক্ষা প্রবলভাবে গৃহীত হইল এবং বাঙ্গালী শূদ্রত্বলাভের জন্য অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া পড়িল, কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর পরে ভুল বুঝিয়া ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে থমকিয়া দাঁড়াইল। লর্ড কার্জনের আঘাত এই উপকারটী করিয়া দিয়াছে। তাই শূদ্রত্ব-প্রাপ্ত বাংলাদেশ স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ করিয়া বৈশ্যত্ব-লাভের জন্য ব্যগ্র হইল, কিন্তু শীঘ্রই বুঝিতে পারিল যে ব্রাহ্মণত্ব এবং ক্ষত্রিয়ত্ব অন্যের হাতে থাকিলে বৈশ্যত্ব-লাভ হইতে পারে না। আজও বুদ্ধিমান্ অনেকে Mammon এর ন্যায় বৈশ্যত্বকে নিরাপদ্ মনে করিয়া তাহাতেই মনোনিবেশ করিতে উপদেশ দেন। অবশ্য স্বীকার করি যে ইহাতে যে কেহ কেহ উপকৃত হইতেছেন তাহা সত্য। কিন্তু সহজেই দেখা গেল যে স্বদেশী আন্দোলন ব্যাপক হওয়া আবশ্যক—অর্থাৎ সকল বিষয়েই ভারতকে তাহার জাতীয় আত্মার অনুগামী হইয়া তাহার শাসন, শিক্ষা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। স্বদেশী আন্দোলনে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের জন্ম, কেননা শিক্ষাদ্বারাই মানুষ তৈয়ার হয়। যে শিক্ষা কেবল আমাদিগকে শূদ্রত্বের জন্য প্রস্তুত করিয়াছিল আমরা সেই শিক্ষা পরিবর্ত্তনের জন্য ভাবিতে লাগিলাম। আজও সেই ভাবনাই করিতেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতে এতগুলি বিশ্ববিদ্যালয়-প্রদত্ত শিক্ষা-সত্ত্বেও আমাদের নায়কগণ শিক্ষাকে ঠিক নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিতেছেন না এবং কিভাবে পরিবর্ত্তন ঘটাইলে জাতীয় আত্মা বিকশিত হইতে পারে তাহা বুঝিতেছেন না। সমাবর্ত্তন উপলক্ষে অনেক বক্তৃতাই হইতেছে, কিন্তু কেহই যে পথ দেখাইতে পারিতেছেন তাহা ত মনে হয় না।

ইউরোপীয় জ্ঞানিগণ সক্রাতিশের সময় হইতে বলিতেছেন যে, ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দেওয়া যায় না। ভারতীয় শিক্ষা-প্রণালীতে কিন্তু ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দেওয়ার জন্যই সব ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এবং তজ্জন্যই শিক্ষা-প্রণালীকে ধর্ম্মানুমোদিতভাবে গড়িয়া তোলা হইয়াছিল। কাজেই আমাদের National Educationকে নিজেদের ছাঁচে গড়িতে হইলে ধর্ম্ম ও নীতি-শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া অন্যান্য বিদ্যাশিক্ষার উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। কি ভাবে প্রাচীন ভাবধারা ও নূতন সত্যসমূহকে সমন্বিত করা যাইতে পারে, তাহা ভাবিতে হইবে। ইংরেজী, ফরাসী, জার্ম্মাণ, জাপানী প্রভৃতি শিক্ষা-প্রণালীতে প্রাচীন জাতীয় ভাবের ধারা বজায় রাখিয়াই নূতনকে গ্রহণ করা হইতেছে। জাতির অন্তর্ভুক্ত সকল নরনারীকে শিক্ষা দান করিয়া পটু ও আত্মরক্ষায় সমর্থ করাই উদ্দেশ্য।

বর্ত্তমান সময়ে কোনো মানুষের শিক্ষালাভের অধিকার অস্বীকার করিলে চলিবে না। বেদ বা জ্ঞানে সকলেরই প্রয়োজন আছে, ইহজীবনেও জ্ঞানের প্রয়োজন, পরজীবনে সত্য বুঝিবার জন্যও জ্ঞানের প্রয়োজন। কাজেই এই দেশের মানুষকে সবল করিতে হইলে তাঁহাদিগকে জ্ঞান দিতে হইবে। তজ্জন্য জ্ঞানের প্রসার আবশ্যক। বিদেশীয়গণ এই বিষয়ে বাধা না দিলেও বিশেষ ব্যগ্রতা অবলম্বন করিতে পারেন না। তাঁহাদের উপেক্ষা ও বাধা সত্বেই আমাদের এই কাজটী করিতে প্রয়াস পাইতে হইবে। জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ-স্থাপনের এইটীই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য; কিন্তু বিগত চল্লিশ বৎসর এই সম্বন্ধে বিশেষ কিছু করা হয় নাই। আমার বিশ্বাস এই—শিক্ষা-সমস্যার সমাধান না হইলে আমাদের জাতীয় আত্মা যে আংশিক ভাবে দুর্ব্বল আছে, সেই দুর্ব্বলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। আমাদের দেশের নরনারীর আত্মিক জাগরণের প্রয়োজন। বিগত প্রায় এক হাজার বৎসর বা ততোধিক কাল যাবৎ অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্ম্মের

গ্লানির সময় হইতে তাঁহারা এক ভাবে নির্জীব অবস্থায় জীবনধারণ করিতেছেন। আমরা যে নব জাগরণের কথা বলি তাহা সমাজের সকল স্তরে বিশেষ প্রবেশ করে নাই। বিংশ শতাব্দীর ভাবধারাতে কিছু নূতনত্ব আছে বটে, কিন্তু তাহাতেও বিদেশী প্রভাবই অধিক কার্য্য করিতেছে, এবং তাহা সর্ব্বথা মঙ্গলজনক মনে করি না। যে গণ-আন্দোলন দেখা দিয়াছে, তাহাতে ভারতীয় আত্মিক দৃষ্টি নাই। কাজেই এই আন্দোলন দ্বারা আমরা ঠিক পথে চলিতে পারিব মনে হয় না। আমার মতে হিন্দু এবং মুসলমান ও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী সকল মানুষকেই আত্মিক শক্তিলাভের জন্য উপদেশ দেওয়া প্রয়োজন। শিক্ষাতে ধর্ম্মের স্থান থাকা আবশ্যক। কি ভাবে এই উপদেশ দেওয়া যায়, তাহা চিন্তা করিতে হইবে। যদি তাহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উপদেশ দেওয়ার আবশ্যকতা বোধ হয় তবে তাহাই করিতে হইবে। কিন্তু ধর্ম্ম ও নীতি-শিক্ষা শিক্ষাতে স্থান পাইবে। ইউরোপ ধর্ম্মের আবশ্যকতা বোধ না করিতে পারে, কিন্তু আমাদের দেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থাতে ইউরোপীয় প্রণালী চলিবে না। যে সব শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক নিজেরা ধর্ম্ম-বিশ্বাসে দুর্ব্বল বা উপেক্ষাশীল, তাঁহাদের দ্বারা এই কাজ হইবে না। উদার-মতাবলম্বী নায়কেরা যদি শিক্ষা পরিচালনা করেন, তাহাতে ফল পাওয়া যাইবে, আমার বিশ্বাস। এদেশের জাতীয় শিক্ষাতে ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা করা অবশ্য-কর্ত্তব্য। তজ্জন্য হিন্দুদের জন্য উপনিষদের সত্যসমূহ বাংলা ভাষাতে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। মুসলমান ও খৃষ্টানদিগকেও তাহাদের ধর্ম্মের প্রধান সত্যগুলি বুঝাইয়া দেওয়া যায়। প্রকৃত ধার্ম্মিক লোকেরা যে ভাবে জীবন-যাপন করেন, তাহাতে সকল জীবনেরই একটা বাহ্যিক একাকারতা দেখা যায়। সাধুভাবে জীবন যাপন সকল ধর্ম্মেই ব্যবস্থিত হইয়াছে। ধর্ম্ম এবং নীতিশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অন্য শিক্ষা দিতে হইবে। একটা পরিষ্কার ধারণা এই বিষয়ে থাকা প্রয়োজন। যে শিক্ষার ধারা একশত বৎসর যাবৎ প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে নূতন ধারা যোগ করিতে হইবে।

বঙ্গদেশের জাতীয় শিক্ষা বাংলা ভাষার ভিতর দিয়াই দিতে হইবে। বিগত এক শতাব্দীতে শিক্ষা আরো অনেক বিস্তৃত হইতে পারিত, যদি লোকেরা মাতৃভাষার ভিতর দিয়া শিক্ষা লাভ করিতে পারিত। এদেশের সাহিত্য, দর্শন, পুরাণ প্রভৃতির স্থান ত ইউনিভারসিটীতে বিশেষ নাই। জাতীয় শিক্ষায় দেশীয় শাস্ত্রের সত্যকে বিদেশী সত্যের এক সঙ্গে গ্রহণ করিতে হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাইবেল পড়ান, তাহা অঠিক মনে করি না, কিন্তু এদেশীয় পুরাণের উপদেশ বর্জন করা ঠিক নহে। ইউরোপীয় সাহিত্যে যে সব নীতিকথা আছে, তাহা উপাদেয় সত্য, কিন্তু বাংলা সাহিত্য এবং সংস্কৃত সাহিত্যেও যথেষ্ট শিক্ষাপ্রদ বিষয় রহিয়াছে। জাপান প্রভৃতি দেশেও ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু তাহারা জাতীয় কৃষ্টির সহিত মিলিত করিয়াই ইউরোপীয় বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতির জ্ঞান গ্রহণ করেন। আমাদের universityতে বিদেশী ন্যায়-শাস্ত্র বা লজিক পড়ান হয়, কিন্তু আমাদের ন্যায়-শাস্ত্রেরও স্থান আমাদের যুক্তিপ্রণালীতে হওয়া আবশ্যক। ইউরোপীয় শাস্ত্রের মূল্য অস্বীকার করি না, কিন্তু আমাদের শিক্ষায় আমাদের শাস্ত্রের স্থান নাই কেন? একশত বৎসরের অভিজ্ঞতা দ্বারা যদি আমরা নিজের ঘরে কি আছে, না বুঝিয়া থাকি এবং কি ভাবে বিদেশী সংঘাতকে সমন্বিত করিয়া লইতে হইবে, নির্দ্ধারণ করিতে না পারি, তাহা হইলে আমাদের শিক্ষা যে পরিপক্কতালাভ করে নাই তাহাই প্রমাণিত হয়। ইউরোপের বিজ্ঞান আমরা শিখিয়াছি এবং শিক্ষার প্রয়োজনও রহিয়াছে। বিজ্ঞান-শিক্ষার সুব্যবস্থা আজও হয় নাই। ইউরোপের বিজ্ঞানই যথেষ্ট নহে। এদেশেও বিজ্ঞানচর্চ্চা ছিল। এদেশের কবিরাজী শিক্ষা দেওয়া

প্রয়োজন মনে করি। এই সম্বন্ধে আমাদের পণ্ডিতগণেরও ভ্রান্ত ধারণা রহিয়াছে। এই সমস্ত ভ্রান্তি দূর করা কর্ত্তব্য। ডাক্তারেরা কবিরাজীকে এখনও অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন। ইহা ঠিক নহে।

আমাদের দেশের লোকেরা ক্রমশঃ শারীরিক দুর্ব্বলতা-গ্রস্ত হইয়া জীবনসংগ্রামে অপটু হইতেছেন। ক্রমবর্দ্ধমান দরিদ্রতা এই জন্য অনেক পরিমাণে দায়ী ; যদিও আমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, তথাপি আমাদের দৌর্ব্বল্য বৃদ্ধির দিকে চলিয়াছে। শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নতি-বিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে সত্য, কিন্তু তথাপি আত্মরক্ষার জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন, তাহার কোনই ব্যবস্থা হইতেছে না। সকল দেশের লোকেরাই আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত, কেবল আমরাই তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। শাসকগণ আমাদের উদাসীনতার সুবিধা অতীতে যেভাবে ভোগ করিয়াছেন, ভবিষ্যতেও সেই ভাবে ভোগ করার উপযোগী ব্যবস্থার চিন্তা করেন, মনে হয়। কাজেই এই উদাসীনতা আমাদিগকেই চেষ্টা করিয়া দূর করিতে হইবে। ইউনিভারসিটী-গুলিতে যদি কিছু মনোযোগ এই বিষয়ে দেওয়া হয়, তাহাতে উপকার হইতে পারে। শরীর কার্য্যক্ষম না হইলে বৈজ্ঞানিক বা অন্য জ্ঞানে কোন ফল পাওয়া যাইবে না। আমাদের ছাত্র-ছাত্রীগণের এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে। আলস্যে অতিবাহিত করার সময় আর নাই। Milton শিক্ষার আদর্শ ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলেন, যে শিক্ষা civil এবং military কর্ত্তব্যসমূহ সম্পাদন করার শক্তি জন্মাইয়া দেয় এবং যাহাতে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ বুঝিবার সুবিধা দান করে, তাহাই পূর্ণ শিক্ষা। যাহারা ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং শিল্প-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন, তাঁহাদের মনে রাখা কর্ত্তব্য যে কেবল বৈশ্যবৃত্তি শিক্ষা করিয়া মানুষ হওয়া যায় না। ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব এবং বৈশ্যত্ব সব কার্য্যেই পটুতার প্রয়োজন। citizen বা নাগরিকমাত্রেই যাহাতে জীবনের সকল প্রকার অবস্থায় নিজের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারে, তাহার উপযোগী শিক্ষা তাহাকে দিতে হইবে। আদর্শ উচ্চই রাখিতে হইবে। এখন পৃথিবীতে এক আদর্শ গঠিত হইতেছে এবং সেই আদর্শ পূর্ণতর। এই আদর্শ বরণ করিতেই হইবে। আমাদের 'বাবু' নাম ঘুচাইয়া যাহাতে আমরা মানুষ অর্থাৎ আত্মনির্ভরশীল হইতে পারি, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিতে হইবে। শিক্ষাপ্রাপ্ত শূদ্র অপেক্ষা অশিক্ষিত শূদ্র অধিক আত্মনির্ভরশীল। আমাদের আত্মনির্ভরশীলতা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা লাভের জন্য তদনুরূপ শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। জাতীয় ভাবে শিক্ষিত লোকেরা শূদ্রত্ব অপেক্ষা বৈশ্যত্ব বা অন্যরূপ স্বাবলম্বনের আদর্শ গ্রহণ করিবেন, নতুবা অগ্রসর হইতে পারিবেন না।

ইংরেজদের প্রবর্ত্তিত শিক্ষা ব্যয়সাধ্য হইয়া উঠিয়াছে ; আমরাও তাঁহাদের মতকেই সমর্থন করিতেছি। উচ্চশিক্ষার জন্য এত ব্যয় করার শক্তি বহুলোকের নাই। তাই শতকরা একজনও প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিতেছে না। এই বঙ্গদেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন প্রবর্ত্তিত হওয়ার সময়ে কেবল ব্রাহ্মণ, বৈদ্য প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর জন্যই ৩০,০০০ টোল ছিল এবং প্রত্যেক গ্রামে পাঠশালা ছিল। এই সব কথা ইংরেজ লেখকগণই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। স্বর্গগত ডাঃ স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় বলিতেন যে ১৮১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ জ্ঞান-রাজ্যে পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় ছিল, কেননা তখন পর্য্যন্ত এদেশে মৌলিক চিন্তা হইতেছিল এবং ব্রহ্মজ্ঞান এই ভাবে ইউরোপ বা অন্য দেশে প্রসারিত ছিল না। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মান দার্শনিক কাণ্টের মৃত্যুর পর হইতে ইউরোপে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রসারতালাভ করিয়া আমাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া দিয়াছে। তিনি আমাকে এই কথাটী প্রচার করার

আদেশ দিয়া গিয়াছেন। এই বিষয় বলিতে এবং লিখিতেও উৎসাহিত করিয়াছেন, কেননা ইহাতে লোকদের ভ্রান্ত ধারণা তিরোহিত হইবে। আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষা ব্যয়সাধ্য ছিল না, শ্রমসাধ্য ছিল। ছাত্রগণ গ্রন্থ স্বহস্তে লিখিয়া লইতেন। এখন ইউনিভারসিটী ব্যয়ভার বৃদ্ধি করিতেছেন নানাভাবে, ইহাতে গরীব ছাত্রগণ নিপীড়িত হইতেছে। গরীব ছাত্রগণই অনেক সময়ে অধিক যত্নশীল থাকেন, কিন্তু এখন দরিদ্রের জন্য উচ্চশিক্ষা নহে, বলিয়া দেওয়া হইতেছে। গবর্নমেণ্টও দরিদ্রের সহায়তা করিতে মোটেই ব্যগ্র নহেন। ইউরোপীয় সভ্যতায় দরিদ্রতা অভিশাপস্বরূপ মনে করা হয়, কিন্তু এদেশে এই ভাব ছিল না। ব্রাহ্মণেরা দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া জ্ঞানান্বেষণ করিতেন। দারিদ্র্য ধর্ম্মলাভেরও অনুকূল ছিল। এখন দারিদ্র্য সর্ব্বপ্রকার উন্নতিলাভের অন্তরায়স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। এখন অধ্যাপকগণের হাজার হাজার টাকা বেতন চাই; তাঁহারাও অন্যান্য অর্থলোভী লোকের ন্যায়ই লুব্ধ, কাজেই জ্ঞানের আদর্শ হীনতা প্রাপ্ত হইতেছে এবং জ্ঞানলাভ করিয়া আত্মা শোধিত হইতেছে না। জাতীয় শিক্ষায় পুনরায় শিক্ষকের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে কিঞ্চিৎ ফললাভের সম্ভাবনা আছে। ইউরোপীয় রজঃপ্রধান আদর্শের সেবা করিয়া আমরা সত্ত্বগুণের কথা বলিয়া থাকি, তজ্জন্যই চরিত্র গঠিত হইতেছে না। অধুনা ছাত্রগণের ব্যবহারেও রজোগুণেরই খেলা দেখি, আমরাও রজোগুণেরই সেবা করি। ইহার পরিবর্ত্তন না হইলে কিছুই হইবে না।

ইউরোপীয় সংঘাতে আমাদের সামাজিক পরিবর্ত্তনও ঘটিতেছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই মানুষের মধ্যে যে সাম্য রহিয়াছে, তাহা প্রচারিত হইতেছে এবং পদদলিত ও অবনত শ্রেণীর লোকেরাও সাম্যের দাবী জানাইতেছেন। ইংলণ্ডে ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে দাস-বিক্রয়-প্রথা রহিত হয় এবং ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ক্রীতদাসদিগকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং তদবধি বিবিধ প্রকারের আইন প্রণয়ন করিয়া শ্রমজীবীদিগকে ধনিগণের নিপীড়ন হইতে রক্ষা করার ব্যবস্থা হইতেছে। ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি প্রগতিশীল দেশে ধনিগণের প্রদত্ত ট্যাক্স দ্বারা দরিদ্রদিগকে নানাপ্রকার সুবিধা করিয়া দেওয়া হইতেছে। দরিদ্রগণের শিক্ষা, চিকিৎসা, আমোদ-আহ্লাদ-ভোগ ইত্যাদি বিষয়ে সাহায্য দিয়া ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে যে বৈরভাব তাহা হ্রাস করার চেষ্টা হইতেছে। ধনিলোকদের দরিদ্রের প্রতি ব্যবহারও যুক্তি-সঙ্গত ভাব ধারণ করিতেছে। ইউরোপে খৃষ্টান ধর্ম্মের অনুশীলনেও একটা সাম্যবাদ রহিয়াছে। জাতিভেদ না থাকাতে অনেক নিম্নশ্রেণীর লোক অর্থসংগ্রহ করিয়া আভিজাত্য লাভ করেন, অনেকে শিক্ষা দ্বারা নিজের অবস্থার উন্নতি হইলে অভিজাত দলে প্রবেশ করিতে পারেন। ধর্ম্মযাজক হইয়া অনেক নিম্নশ্রেণীর লোক পোপ পর্য্যন্ত হইয়া রাজার মস্তকে পা দিয়াছেন। কাজেই ইউরোপে লোকের মনে উচ্চাভিলাষ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা যে ভাবে কার্য্য করিয়াছে, এখানে তাহা সম্পাদিত হয় নাই। ইউরোপে সকলেই অবস্থার উন্নতির জন্য সচেষ্ট এবং তজ্জন্য পৃথিবীতে সর্ব্বত্র অর্থান্বেষণে ঘুরিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে, বিশেষতঃ বিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশে এই ভাবের আকাঙ্ক্ষা লোকের মনে ক্রিয়া করিতেছে। এখন সকলেই শিক্ষালাভ করিয়া বা ধনাগমের দ্বারা অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটাইতে সচেষ্ট। নানা প্রকার caste conferences হইতেছে এবং কাহাকেও নীচ বা অবহেলিত বলা যায় না। ইহা উন্নতির লক্ষণ; কেহই নিজের অবস্থায় তৃপ্ত নহে। ইহাতে দেশের মঙ্গলই হইবে, মনে হয়। জগন্নাথের রথ চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। অশিক্ষিত দরিদ্র লোকেরাও অনেক উৎসাহ পাইতেছে এবং নানা প্রকারের দাবী জানাইতেছে। এই জাগরণের ভাব

অবশ্য ইউরোপীয় সংঘাতেরই ফল। মেয়েরা যে সাম্য চাহিতেছেন, শিক্ষা চাহিতেছেন, সম্পত্তিতে ভাগ চাহিতেছেন এবং স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়া নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে প্রয়াস করিতেছেন, ইহাও মঙ্গলজনক। ইহাতে আমাদের শক্তিলাভ হইবে। কেহই অসহায় অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে চায় না। ইংরেজশাসনে যে এই নব চেতনা, নব শক্তির সূচনা দেখা যাইতেছে, ইহাই আমাদের লাভ। আমাদের অর্থ ইংরেজেরা শোষণ করিয়াছেন ও করিতেছেন সত্য, তথাপি যে আমাদের "অচল আয়তনে" গতি সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহাতে ক্ষতির কতকটা পূরণ হইবে, আশা করা যায়। সামাজিক সংস্কারের যে প্রয়োজন রহিয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং তদনুসারে সংস্কারও অগ্রসর হইতেছে। রামমোহন রায়ই প্রথম সেই পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং অনান্য সংস্কারকগণ যে জাগরণের কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাহার ফল এখন দেখা যাইতেছে এবং তজ্জন্য যে সমাজ অগ্রসর হইতেছে তাহাও স্বীকার্য্য। মেয়েদের শিক্ষা আর এখন তর্কের বিষয় নয়, তবু কি ভাবে মেয়েদের শিক্ষা দিতে হইবে, সেই বিষয়ে চিন্তার প্রয়োজন। যে শিক্ষা বালকগণের পক্ষেই প্রযোজ্য মনে হয় না, তাহা ত মেয়েদের পক্ষে অপ্রযোজ্যই, তবুও আমরা অন্ধের ন্যায় এই শিক্ষাই দিতে চেষ্টা করিতেছি। ইহাতে ফল সম্পূর্ণরূপে মঙ্গলজনক হইতেছে না। যুবক-যুবতীগণ একই ভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাস হারাইয়া দেহাত্মবাদী হইয়া উঠিতেছেন। ভারতীয় সভ্যতার যেটুকু বৈশিষ্ট্য ছিল তাহা লোপ পাইতে চলিয়াছে। আমার বিশ্বাস আমাদের নিজস্ব ভাবধারা হইতে আমরা পৃথক্ হইয়া পড়াতে এইরূপ ঘটিতেছে। আমাদের বৈদিক ও বৈদান্তিক চিন্তাধারাতে সন্দেহবাদ দূর করার ব্যবস্থা আছে এবং তাহার সঙ্গে আমাদের আত্মার একটা যোগ আছে। আমাদের রক্ত যে ভাবে পূর্ব্বপুরুষগণের রক্তের সঙ্গে যুক্ত আমাদের আত্মার সঙ্গে তাঁহাদের আত্মারও যোগ আছে। কিন্তু তাঁহাদের চিন্তার প্রণালী হইতে আমরা পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছি। উনবিংশ শতাব্দীর লোকেরা তবুও সেই যোগ কতকটা রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু আজ বিংশ শতাব্দীতে সেই যোগ ক্রমশঃ শিথিল হইয়া যাইতেছে। ইউরোপীয় সাহিত্য, ইউরোপীয় ইতিহাস, ইউরোপীয় নীতিবাদ, রাষ্ট্রতন্ত্র, সমাজতন্ত্র প্রভৃতি আধুনিক যুবক-যুবতীকে বিভ্রান্ত করিতেছে। তাঁহারা ইউরোপের বাহ্যিক চাকচিক্যে একবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িতেছেন। স্বাধীনতার আগ্রহ তাঁহাদের মনে জাগিয়াছে সত্য এবং জাতীয়তা বা Nationalismএর আদর্শও তাঁহারা ধরিতেছেন, কিন্তু ভারতের যে বিষয়ে প্রধান গৌরব, তদ্বিষয়ে তাঁহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হইতেছে না। ভোগমূলক আদর্শ তাঁহাদের আত্মাকে অভিভূত করিতেছে। আমাদের ইহার প্রতিকার চিন্তা করা আবশ্যক। সম্পন্ন শ্রেণীর বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহের ভাব জাগিয়াছে, তাহা সকল প্রকারের কায়েমী অধিকারের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইতেছে। তজ্জন্য সমাজের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ চলিতেছে। এই প্রকার বিদ্রোহে সমস্ত সমাজ নষ্ট হইতে পারে। চিন্তা-নায়কগণ যদি সাবধান না হন তবে বিপদের সম্ভাবনা রহিয়াছে। সত্য গোপন করিলে প্রকৃতি প্রতিশোধ লইবে। মানুষমাত্রকেই মনুষ্যত্ব-দানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ইংরেজরা যে ভাবে আমাদিগকে দমন রাখেন, আমাদের নিজেদের লোকেরাও সেই ভাবেই নিম্নস্থ লোকদিগকে চাপিয়া রাখিতেছেন। ইহাতেই অসন্তোষ-বহ্নি ক্রমশঃ ধূমায়মান হইতেছে। সমাজপতিগণ যদি যথাসম্ভব এই অসন্তোষের কারণ দূরীভূত করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে হয়ত ক্রমে লোক শান্তভাব ধারণ করিয়া স্ব স্ব উন্নতির কার্যে ব্রতী হইতে পারে। অস্পৃশ্যতা-দোষ আইন পাশ করিয়া নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া উচিত এবং হিন্দুমহাসভা হইতে

জাতিভেদ-সত্ত্বেও একটা সমতা যে মানুষের মধ্যে রহিয়াছে, তাহা প্রচার করা কর্ত্তব্য। জাতিভেদ এদেশের মজ্জাগত, কাজেই ইহার বিরুদ্ধে মিলিতভাবে কিছু করার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যাঁহারা দেশের মঙ্গল কামনা করেন, তাঁহারা এই ভেদের উপর অত্যধিক গুরুত্ব অর্পণ না করিলেই ভাল হয়। আদম-সুমারীতে লোকেরা শুধু হিন্দু কি মুসলমান লিখিবে; আদালতেও দলিল-দস্তাবিজে শুধু নিজ নাম ও পিতার নাম থাকিবে। কে কোন্ জাতিভুক্ত তাহা লিখিবার নিয়ম বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। এই ভাবে হিন্দুগণের মধ্যে যে ভেদটি অত্যন্ত আপত্তিজনক কেহ কেহ মনে করেন, তাহা দূরীকরণের চেষ্টা করা যাইতে পারে। Inter-caste marriage কে legalised করাও আবশ্যক। এই সংস্কারের পক্ষে গৌড়ের আইন যথেষ্ট নহে। ইহাতে কতকগুলি ত্রুটী রহিয়াছে। চর্ম্মের রংএর প্রাধান্য ইউরোপীয়েরা নানাভাবে বজায় রাখিতেছেন, আমরাও caste-এর প্রাধান্য মানি। ইহাতে হিন্দুর একতা বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। হিন্দুরা যদি একতা সংসাধিত করিতে পারেন, আমার বিশ্বাস মুসলমানেরাও এই শক্তিমত্তা স্বীকার করিয়া সন্ধি করিতে অগ্রসর হইবে। দুর্ব্বলের শত্রু সকলেই, কিন্তু সবলকে বন্ধু বলিতে কেহ দ্বিধা করেন না। মহারাষ্ট্র ও শিখ-শক্তির সহিত বন্ধুতা-লাভের জন্য সকলেই ব্যস্ত ছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ দিল্লীশ্বরের রক্ষক হইয়া উঠিয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য সভ্যতার আঘাতে যে জাগরণ দেখা দিয়াছে তদ্দ্বারা আমাদের আর্থিক চেষ্টাতেও কিছু কিছু ফল হইতেছে, যদিও পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বৈশ্যত্বও শাসকগণের হাতেই চলিয়া গিয়াছে। একজন চিন্তাশীল ঐতিহাসিক লেখক বলেন যে মোগলরাজত্ব-ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই এদেশে ক্ষাত্রশাসন উঠিয়া গেল। মুসলমান শাসকগণ অর্থাৎ মোগলপাঠানগণ ক্ষাত্রভাবাপন্নই ছিলেন, কাজেই এদেশের লোকের বৈশ্যত্ব তাঁহাদের অধীনতায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই, কিন্তু সেরাজউদ্দৌলাকে এদেশীয় এবং পাশ্চাত্য ধনতান্ত্রিক নেতারা সিংহাসনচ্যুত করিয়া রাজশক্তি কাড়িয়া লইলেন। তদবধি দেশীয় ধনিগণ ও বিদেশী ব্যবসায়িগণ মিলিত হইয়া এদেশে বৈশ্যশাসন প্রবর্ত্তিত করিলেন এবং তদনুসারে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। ইহাতে বৈশ্যশাসনের যে ফল তাহা ঘটিতেছে; অর্থাৎ দেশের ধন ধনীদিগের হাতে সঞ্চিত হইয়া লোকের দরিদ্রতা বৃদ্ধি করিতেছে। * অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতে অরাজকতা-সত্ত্বেও লোকের এত অভাব ও এত দুর্ব্বলতা দেখা যাইত না, কেননা লোকের খাওয়ার অভাব হয় নাই। শিশুকালে এত অভাব দেখি নাই, কিন্তু অভাব, দৈন্য ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। ইংলণ্ডের প্রত্যেক পরিবারের এক-পঞ্চমাংশ আয় নাকি ভারতবর্ষ হইতে পাওয়া যাইতেছে। নানা ভাবে অর্থ এদেশ হইতে চলিয়া যাইতেছে। মোগলদের সময়ে অপব্যয়-সত্ত্বেও দেশ এইরূপ হৃত-সর্ব্বস্ব হইতে পারে নাই, কেননা দেশের অর্থ দেশেই থাকিত। কাজেই এখন আমাদিগকে অর্থার্জনেই সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে হইতেছে। পূর্ব্বপুরুষেরা জীবিকার জন্য এত ব্যস্ত ছিলেন না, তাঁহাদের অভাবও এত রকমের ছিল না। আমাদের অভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু উপার্জনের পথ বিশেষ কিছু নাই। চাকুরীজীবিগণের সন্তান-সন্ততিগণ কোনো ব্যবসায়ও অবলম্বন করিতে পারিতেছেন না। আমরা বাঙ্গালীরা ত ব্যবসায়ক্ষেত্রে একেবারে অকেজো হইয়া পড়িয়াছি। সুতরাং এখন আমাদের বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া শিল্পোন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। একটু আশা সঞ্চারিত হইতেছে;

---

* এদেশে দানই ধর্ম্মের অনেকখানি বলিয়া বিবেচিত হইত; তজ্জন্য আঢ্য লোকেরা দান করিয়া হৃতসর্ব্বস্ব হইতেন ও দরিদ্রের পোষণ হইত। দান করিয়া ধনী কৃতার্থ হইতেন। এখন ব্যাঙ্কে কোটি কোটি টাকা balance থাকিলে কৃতার্থতা-লাভ হয়। কাজেই communism এর তত্ত্ব প্রচারিত হইতেছে।

কেননা শিক্ষিত লোকেরা চাকুরীর মোহ কতকটা অতিক্রম করিয়াছেন এবং ইউরোপীয় প্রণালী অবলম্বনপূর্ব্বক শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিকল্পে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। আমরা ৩।৪ পুরুষ যাবৎ চাকুরীজীবী হইয়া পড়িয়াছি, তজ্জন্য অকৃতকার্য্য হইতেছি ; কিন্তু অধ্যবসায় অবলম্বন করিতে পারিলে কৃতকার্য্য হওয়া যাইবে, আশা আছে। পাশ্চাত্ত্য আঘাতের ফলস্বরূপ যে জাগরণ ঘটিয়াছে তাহাতে আমাদের শিক্ষা, সমাজ, শিল্প সবদিকেই পরিবর্ত্তন আসিতেছে। সাহিত্যেও একটা জাগরণের ভাব চলিতেছে।

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ফলস্বরূপ ভারতের সকল প্রদেশেই প্রাদেশিক ভাষায় এক একটা সাহিত্য জন্মিয়াছে। তন্মধ্যে আমাদের বঙ্গসাহিত্যেই সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতি লাভ ঘটিয়াছে। তামিল, তেলেগু, গুজরাটী, মহারাষ্ট্রী, হিন্দি, আসামী, উর্দ্দু, পাঞ্জাবী প্রভৃতি সাহিত্যের নাম করা যাইতে পারে। ভারতে পাঁচ শতের উপর কথ্য ভাষা এবং এক শতের উপর লিখিত ভাষা প্রচলিত আছে! প্রত্যেক প্রদেশেই মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করা হইতেছে। তামিল সাহিত্যের উন্নতির জন্য আন্নামেলাই বিশ্ববিদ্যালয়ে, তেলেগু ভাষার উন্নতিকল্পে অন্ধ্র বিশ্ববিদালয়ে, বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ চেষ্টা—সবই নব জাগরণের ফল।*

" ভয়ে ভয়ে লিখি, ভয়ে ভয়ে গাই,
না হলে শুনিতে এ বীণা-ঝঙ্কার। "

রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত প্রকৃত জাতীয় সাহিত্য গড়ে না ; কাজেই আমাদের দেশীয় সাহিত্যগুলিতে পূর্ণভাবে প্রাণের প্রকাশ দেখা যায় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জাতীয় জীবনের সকল চেষ্টাতেই একটা অঙ্গাঙ্গিভাব থাকা প্রয়োজন। রাষ্ট্র পৃথক্ থাকাতে আমাদের সকল চেষ্টাতেই জীবনী-শক্তির অভাব দৃষ্ট হয়। যদিও বঙ্গসাহিত্যের নবসাধনা-সম্বন্ধে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বিশেষ কিছু বলা সম্ভব নহে, তথাপি ইহাতে যে জাগরণ প্রমাণিত হইতেছে, তাহার উল্লেখ করিলাম। বাঙ্গালী জাতির গৌরব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বিশ্বমানবের নিকট পরিচিত হইয়াছেন। ইহাতে আমাদের মনে নব উৎসাহ জাগ্রত হইয়াছে। আমাদের বঙ্গসাহিত্য ক্রমশঃ শক্তি-সমৃদ্ধ হইতেছে। ইহার বিবিধ শাখার উন্নতি-লাভ হইবে, যখন এই ভাষার ভিতর দিয়া বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতির জ্ঞান দান করা সম্ভব হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়েই এই কার্য্যের সূচনা হইবে, আশা করি। আমাদের আধ্যাত্মিক ও মানসিক শক্তি যদিও প্রমাণিত হইতেছে, তথাপি আমাদের লেখকগণ সকলে আত্মিকভাবে দৃষ্টিসম্পন্ন নহেন, ইহাতে সাহিত্যের গতি অনুকরণপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে। এই কথা মনে রাখা কর্ত্তব্য যে ভারতীয় আত্মার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। ভগবান্ প্রত্যেক Nation বা জাতিতে, প্রত্যেক ব্যক্তিতে, প্রত্যেক পরিবারে, এমন কি প্রত্যেক বৃক্ষপত্রে একটা বিশেষ আকারে রূপায়িত হন। তিনি বৈচিত্র্যময়। দুইটা পাতা এক রকম হয় না। দুইটি ব্যক্তির মুখও একরূপ নয়। কাজেই বৈশিষ্ট্যবর্জিত হইয়া সার্ব্বজনীনতা থাকিতে পারে না। স্বর্গগত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বিশ্বমানব, বিশ্বমৈত্রী, বিশ্বপ্রেম এই সমস্ত কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, তথাপি

* আমরা ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে জাতীয় শিক্ষার বাহন বাংলা ভাষা করার পর হইতেই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ বাংলা ভাষার দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে আরম্ভ করেন। এই বিষয়ে আমরা স্বর্গগত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট বিশেষভাবে ঋণী। কালে সর্ব্বত্র ইংরেজীকে Compulsory Second language এ পরিণত করিয়া মাতৃভাষার ভিতর দিয়া শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

তাঁহার ভাবধারাতে ভারতীয় হিন্দু আত্মারই নানাভাবের প্রকাশ দেখা যায়। আমাদের চিন্তানায়কগণের মধ্যেও এই হিন্দু আত্মার নানাভাবের বিকাশ ঘটিয়াছে। মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ কথা-সাহিত্যে বেশ দেখিতে পাই, কিন্তু তথাপি মনে হয় যে অধিকাংশ লেখক যেন ফ্রয়েড্-প্রমুখ ইউরোপীয় লেখকগণের মতের অনুগামী হইয়া সাহিত্যকে ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার উপায়-স্বরূপ করিয়া তুলিতেছেন। আমার ধারণা ঠিক না হইতে পারে, কিন্তু আধুনিক সাহিত্যে যে ইউরোপীয় অনুকরণে একটা বদ হাওয়ার সৃষ্টি হইতেছে, তাহা চিন্তাশীল লোকেরা বলিয়া থাকেন। মানব-চরিত্রকে যাহাতে বিবিধ তত্ত্বের ভিতর দিয়া, বিবিধ জ্ঞান ও ভাবরসের ভিতর দিয়া সকল রসের উৎসের দিকে লইয়া যাওয়া যায়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। রামায়ণ কি মহাভারত পাঠ করিলে সকল প্রকারের রসই পাওয়া যায়। কিন্তু পাঠ শেষ করার পর মনে যে দাগ থাকিয়া যায়, তাহাতে আত্মা "রসো বৈ সঃ"র দিকে মুখ ফিরায়। গ্রন্থ পাঠ করিয়া যদি ইন্দ্রিয়বৃত্তি উত্তেজিত হয়, এবং আত্মা বিস্মৃতি-সাগরে বিলীন হয়, ইহাতে ক্ষতি হইল, স্বীকার করিতে হইবে। "কাব্যং যশসে অর্থকৃতে, শিবেতরক্ষতয়ে, কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে"—কাব্যালোচনায় আনন্দ, অর্থ ও যশোলাভ হয়, এবং অমঙ্গল নাশ হয়, ইত্যাদি। এই আদর্শ মনে রাখিয়া যদি আমাদের গ্রন্থকারগণ কথা বলেন, তাহাতে উন্নতিই লাভ হইবে। মানুষকে পশুত্বে ঠেলিয়া দেওয়া কাব্যসৃষ্টির উদ্দেশ্য হইতে পারে না। এদেশের বৈদিক যজ্ঞাদির শেষে ফলশ্রুতি-নামক অনুষ্ঠান হইত, তখন বৃদ্ধলোকেরা তাঁহাদের অভিজ্ঞতাপ্রসূত লোকচরিত্র ও মহৎ জীবনের আলোচনা করিতেন। গল্প বলা বৃদ্ধের স্বভাব। এই সকল গল্প হইতেই রামায়ণ, মহাভারতাদি উপাখ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে। বেদেই যযাতি প্রভৃতি রাজার উল্লেখ রহিয়াছে এবং উর্ব্বশী ও পুরূরবার গল্প লিখিত দেখা যায়। মানবশিক্ষার জন্যই এইরূপ কথাসাহিত্য সৃষ্ট হইয়া বৃহদাকার ধারণ করিয়াছে। সংস্কৃত উপাখ্যানে ও পালিসাহিত্যে জাতক-গল্প প্রভৃতি বহু কথা এদেশে লিখিত ও মৌখিকভাবে প্রচারিত হইয়াছে। নানা প্রকারের রস এই কথা-সাহিত্যে অবতারিত দেখা যায়। ইহাতে লোক-শিক্ষারই ব্যবস্থা রহিয়াছে। আমাদের লেখকগণও রসসম্ভোগ করাইবার জন্যই ব্যগ্র। কিন্তু সেই রসদ্বারা যাহাতে মানুষের দেহ, মন এবং আত্মা সুস্থ ও সবল হইয়া উঠে সেই কথাটী মনে রাখা বিধেয়।

আমাদের Europeanisation বা য়ুরোপীয় ভাবাপন্ন হওয়ার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। আমি এই ভাবধারাই আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে প্রধান অন্তরায় মনে করি। ইহার প্রভাবে আমরা শারীরিক সুখসুবিধার জন্যই ক্রমশঃ অধিক চিন্তিত ও ব্যগ্র হইতেছি, ইহাতে পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও হিংসার ভাব বৃদ্ধি পাইতেছে। বৈজ্ঞানিক শিক্ষা লাভ করিয়া দেহের সুখসুবিধা ও দৈহিক স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানলাভ হইতেছে। ইহাতে আপাততঃ লাভবান্ হইতেছি সত্য, কিন্তু আত্মিক বিষয়ে অমনোযোগী হইতেছি। এক একটা সভ্যতার বিশেষত্ব যাহা পূর্ব্বে ছিল, তাহা কি ভাবে বজায় রাখিয়া পৃথিবীর সকল লোকের সভ্যতার সঙ্গে তাল রাখা যাইতে পারে, তাহা ভাবিবার বিষয়। আমাদের সভ্যতা আধ্যাত্মিক ভাবধারাকে জীবনের মূলভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহাকে বাঁচাইয়া যদি অন্য কৃষ্টি ও সভ্যতা গ্রহণ করিতে না পারি, তাহা হইলে সভ্যতা ও কৃষ্টি হইতে দূরে থাকাই শ্রেয়ঃ মনে হয়। ইউরোপীয় বিজ্ঞান প্রকৃতি-বিষয়ে নানা তত্ত্ব শিক্ষা দিতেছে, যন্ত্র-সহযোগে পণ্যদ্রব্য তৈয়ার করিতেছে, দেহের জন্য নানা প্রকার আরামের ব্যবস্থা করিতেছে, লোকদিগকে আত্মনির্ভরশীল করিতেছে, সাম্যবাদ শিক্ষা দিয়া সর্ব্বত্র গণতন্ত্রের দাবী প্রচার

করিতেছে—এই সমস্ত প্রগতিমূলক প্রচেষ্টা সর্ব্বত্র আদর্শ হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু জীবন যে ক্ষণস্থায়ী, পার্থিব সুখসম্পদ্ যে অনিত্য, প্রেমের দ্বারা যে জীবন মধুময় হয়, পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অপেক্ষা পরস্পরকে সাহায্য করিতে পারিলে যে অধিক আত্মিক সন্তোষ লাভ করা যায় ; শ্রেষ্ঠব্যক্তির সঙ্গে গা না ঘসাইয়া তাঁহার নিকট আনুগত্য-স্বীকারে যে আত্মা উন্নত হয়, স্ত্রীপুরুষের মধ্যে প্রতিযোগিতা না বাড়াইয়া সহানুভূতির ও পরস্পরকে সাহায্য করার প্রবৃত্তি প্রবর্দ্ধিত করিলে যে সমাজে শান্তি বিরাজ করিতে পারে, এই সব সত্য চাপা পড়িয়া যাইতেছে। আত্মনির্ভরতা একটী সদ্‌গুণ বটে, কিন্তু ইহাতে যদি অসহায়কে সাহায্য-দানে বিমুখ করে, তাহাতে আধ্যাত্মিক ক্ষতি হয়। "গুরুবাদ" নিন্দনীয় যখন 'গুরুই সব করিয়া দিবেন' এই বিশ্বাস নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চেষ্টা হইতে মানুষকে বিরত রাখে, কিন্তু ইহা পরিত্যাগ করিয়া যদি ঈশ্বরকেও ভুলিয়া যাই, জ্ঞানী আচার্য্যের উপদেশ-গ্রহণে বিমুখ হইয়া পড়ি, তাহাতে অত্যন্ত ক্ষতি হইল।

পূর্ব্বে গুরুগণ শিষ্যগণের ভরণ-পোষণ করিতেন ও জ্ঞান শিক্ষা দিতেন। গুরু ছিলেন জ্ঞানের ভাণ্ডার। তাঁহার মুখনিঃসৃত না হইলে, জ্ঞানলাভ সুদূর-পরাহত ; কাজেই গুরুর একান্ত আনুগত্য ছিল শিষ্যের ধর্ম্ম। গুরুর দোষ আবরণ করাই ছিল ছাত্র শব্দের অর্থ। শিষ্য গুরুর দোষ শ্রবণ করিতেও অনিচ্ছুক ছিলেন। যেখানে গুরুর দোষ অন্যে বর্ণনা করিবে, সেস্থান হইতে প্রস্থান করিতেই শিষ্যকে উপদেশ দেওয়া হইত। গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা না থাকিলে জ্ঞানলাভ হইতে পারে না ; ইন্দ্রিয়-সংযম শিক্ষা করা যায় না। ইন্দ্রিয় সংযত না হইলে, ব্রহ্মচর্য্য পালন করা যায় না এবং জ্ঞান স্ফর্ত্তিলাভ করিতে পারে না। জ্ঞান স্ফূর্ত্তিলাভ না করিলে, ছাত্র-জীবনই বৃথা হইয়া গেল।

আমরা মায়না দেই। শিক্ষক বেতনভোগী ভৃত্য। তাঁহার সঙ্গে প্রেমের বা শ্রদ্ধার যোগ আর নাই, অর্থের যোগ-দ্বারা তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্য আদায় করিতে হইবে। যদি তিনি তাহা না দেন বা দিতে না পারেন, তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইতে হইবে, তাঁহার সহিত কোন আত্মিক যোগ নাই। যে কোন ব্যক্তি শিক্ষক হইয়া আসিতেছেন, তাঁহার সহিত আত্মার যোগ হবার প্রয়োজন নাই। সব সময়ে যোগ হইতেও পারে না। ছাত্রগণ সর্ব্বত্রই শিক্ষকের অধীনতা-স্বীকারে পরাঙ্মুখ এবং শিক্ষকগণও ছাত্রগণের মঙ্গল অপেক্ষা নিজের মঙ্গলই অধিক চিন্তা করেন। কিরূপে চাকুরী বজায় থাকিবে, কিরূপে কিঞ্চিৎ অধিক অর্থ লাভ হইতে পারে, তাহাই শিক্ষকগণের চিন্তার বিষয়। সভাসমিতি করিয়া এই সব দাবীই প্রচার করা হইতেছে এবং শিক্ষা-মন্দিরগুলির হাওয়া দূষিত হইয়া উঠিতেছে। চতুর্দ্দিকেই কেবল দাবী-দাওয়ার কথা। শ্রমিকগণের দাবী আর পূরণ হইতেছে না, তাই ধর্ম্মঘট, গুলিবর্ষণ ইত্যাদি। ছাত্রগণের দাবী শিক্ষকগণ মিটাইতে পারিতেছেন না, কাজেই বিদ্যালয়েও ধর্ম্মঘট, শিক্ষকগণের নতিস্বীকার ইত্যাদি। এই আবহাওয়া ইউরোপীয় শিক্ষা ও ভাবধারার অপরিহার্য্য ফল।

পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে সর্ব্বত্রই সাম্যবাদ। ইহাতে যে ভক্তিসাধনা বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে, তাহা সকলেই স্বীকার করেন, অথচ ইহার প্রতিকার চিন্তা করেন না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে এই সাম্য সর্ব্বত্র সত্য নহে ; ইহা আদর্শও হইতে পারে না, কেননা বিধাতা এই সাম্য সৃষ্টি করেন নাই ; তিনি আধ্যাত্মিক সমতাদানে সর্ব্বভূতস্থ হইয়া আছেন। ইউরোপীয় সাম্য অবশ্য কতক পরিমাণে স্বীকৃত হইয়াছে এবং তাহাতে কিছু উপকারও হইতেছে, কেননা প্রাচীনসময়ে ও মধ্যযুগে মানুষে মানুষে কতকগুলি অযৌক্তিক বৈষম্য বর্ত্তমান ছিল।

অযৌক্তিক ভেদ তিরোহিত করার যে চেষ্টা তাহা ইউরোপীয় সাম্যবাদ-দ্বারা সংসাধিত হইতেছে। কাজেই বর্ত্তমানকে আমরা একেবারে বর্জন করিতে পারি না। বর্ত্তমান সময়ের সঙ্গে প্রাচীন ভাবধারা সমন্বিত করিয়াই আমাদিগকে চলিতে হইবে। এখন ব্যক্তি-বিশেষ বা শ্রেণী-বিশেষকে কোন সুবিধা বা সুযোগ হইতে বঞ্চিত রাখা উচিত মনে হয় না। মনুষ্যমাত্রেই কতকগুলি অধিকার সমানভাবে ভোগ করিবে, ইহাতে কোন প্রকার ভেদ থাকিতে পারে না—এই সত্য স্বীকৃত হইতেছে। যে সব সত্য স্বীকৃত হইতেছে, তাহা পালন করিয়া সব ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে হইবে। বর্ত্তমান প্রগতির ইহাই ভিত্তি। পূর্ব্বে মেয়ে সন্তানকে অভিশাপ-রূপে গণনা করা হইত। এইরূপ অযৌক্তিক মনোভাব পোষণ করা নিতান্ত অজ্ঞতার ও হৃদয়হীনতার পরিচায়ক বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। কোন শাস্ত্র বা জ্ঞান শ্রেণী-বিশেষের পক্ষে নিষিদ্ধ, এই বিশ্বাস কোন জ্ঞানী লোক এখন সমর্থন করিবেন না। মানুষকে মানুষ অস্পৃশ্য মনে করিবে ও তাহা দ্বারা আত্মপ্রসাদ লাভ করিবে, এই বিশ্বাসকে আর সভ্যজনোচিত মনে করা যাইতেছে না। এক ধর্ম্মে বিশ্বাসী অন্য ধর্ম্মে বিশ্বাসীকে যদি ভ্রান্ত মনে করে ও তদনুসারে হিংসা করে, সেই ধর্ম্ম-বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা দেওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিতেছে। পরমতসহনশীলতাই শিক্ষার পরিচয় দেয়। উচ্চ এবং শিক্ষিত-শ্রেণীকে ত্যাগ-স্বীকার অভ্যাস করিতে হইবে। পূর্ব্বে রাজারা সব সম্পত্তি বিতরণ করিয়া নিঃস্ব হইতেন, ও ধর্ম্মচিন্তায় শেষ দিনগুলি যাপন করিতেন। সেই ভাবে সনাতন সত্যকে যদি উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষিত নেতারা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা মহাত্মা হইয়া পূজা পাইতে পারিবেন। ত্যাগের দ্বারা সর্ব্বত্রই লোকপ্রিয় হওয়া যায়, বিশেষতঃ এই দেশে। আমাদের ঋষিগণ ও রাজন্যবর্গ ত্যাগীই ছিলেন। আজও শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে, পুনরায় ত্যাগের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে। ভারতীয় ধর্ম্মে কতিপয় সনাতন সত্য নিহিত আছে, যাহা চিরকাল সত্য বলিয়া গৃহীত হইবে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সেই সত্যের বিরোধ নাই। সর্ব্বভূতে যিনি ব্রহ্মসত্তা দেখিতে পারিবেন, তাঁহার সহিত কাহারও বৈরভাব থাকিতে পারে না। তিনি সর্ব্বভূতের প্রতি নির্বৈরভাব লাভ করেন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এই উদারভাব অবলম্বন করিয়া অন্যদের অত্যাচার ও আক্রমণ সহ্য করিয়াও তিষ্ঠিয়া ছিলেন। আমাদিগকেও সহনশীল হইয়া বিচার-পূর্ব্বক যাহা ভাল তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদের আধ্যাত্মিক ভূমির উপর দাঁড়াইয়া আমরা যুক্তি-সহকারে সকল প্রকারের সত্য গ্রহণ করিতে পারিব। বেদ মানুষের মনেই প্রকাশিত হইয়াছিল এবং সর্ব্বদাই প্রকাশিত হইবে। এই বেদ-প্রকাশ-ব্যাপার নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। শাস্ত্রে আছে, বেদ ব্রহ্মার হৃদয়যোগে প্রকাশিত হইয়াছিল। ব্রহ্মা ছিলেন এই আদি কবি। প্রত্যেক মানব-সন্তান এই আদি কবি হইতে অধিকারী। ব্রহ্মা-শব্দে প্রতি জীবগত মনকে বুঝায়। যোগবাশিষ্ঠও এই মত সমর্থন করেন। "প্রতি জীবের মনের সন্নিধানেই তাহার অনুরূপ সৃষ্টি স্বয়ং ভগবানের সংকল্পমাত্রে প্রকাশিত থাকে। জীবের মন আপনার অনুরূপ যাহা দেখিতে পায় তাহাই অনুভব করিয়া থাকে এবং তাহাতেই মনের প্রতি স্রষ্টৃত্ব আরোপিত হয়।" এই ভাবে পণ্ডিতগণ বুঝাইতেছেন যে, প্রতিহৃদয়ে একটা সৃষ্টি-তত্ত্ব প্রকাশিত হইতেছে। এই প্রকাশই বেদ। আমরা যত জ্ঞানলাভ করিব, সবই এই বেদের অন্তর্গত হইয়া আমাদিগকে পথ দেখাইবে। সুতরাং যদি ঈশ্বরে বিশ্বাসকে জ্ঞানের ভিত্তিতে দৃঢ় করিয়া আমরা নানা বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করি, তাহা হইলে আমরা হিরণ্যকশিপুর অবতার হইয়া ঈশ্বরকে অস্বীকার করিব না ও অনর্থ সৃষ্টি করিব না। এই

জ্ঞান ইউরোপীয় ভাবধারাকে পরাভূত করিয়া আমাদিগকে সনাতন বেদপন্থীই রাখিয়া দিবে। বেদ কি এবং কিভাবে বেদ প্রকাশিত হয়, তাহা উত্তমরূপে বুঝা আবশ্যক।

ইউরোপীয়গণ এদেশে ধনলোভী হইয়া আসিয়াছেন এবং সভ্যতা-বিস্তারের ভান করিতেছেন, আমরা চিন্তাবিহীন ভাবে তাঁহাদের সভ্যতাকে বরণ করিয়া লইয়াছি। কিন্তু আমাদের নেতৃবৃন্দ রামমোহনের সময় অবধি আমাদিগকে সাবধান হইতে উপদেশ দিতেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দী হইতে অনেক মনীষী এই সম্বন্ধে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিতেছেন। আমি এই সামান্য প্রবন্ধে তাঁহাদের নাম ও কার্য্য বর্ণনা করিতে অক্ষম, তবে এই কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, ধর্ম্ম-বিষয়েই তাঁহারা সগর্ব্বে এই সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। কাজেই আমরা যদি আমাদের চিন্তা ও জীবন হইতে ধর্ম্মকে বাদ দিয়া জীবন-পথে চলি, তাহা হইলে ইউরোপীয় কৃষ্টির নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইব। আমাদের কৃষ্টির যে বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা তাহার স্থান যদি আমাদের শিক্ষা ও সাধনায় না থাকে, তাহা হইলে আমাদের সন্তান-সন্ততি যে বহুকাল হিন্দুনামে গৌরব বোধ করিবে তাহা মনে হয় না। যে ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা ছিল বলিয়া আমরা আজও দাঁড়াইয়া আছি এবং ঝড়ঝঞ্ঝা সহ্য করিতেছি, সেই ভূমি পরিত্যাগ করিলে আমাদের বাঁচিয়া থাকা সম্ভবপর হইবে না।
